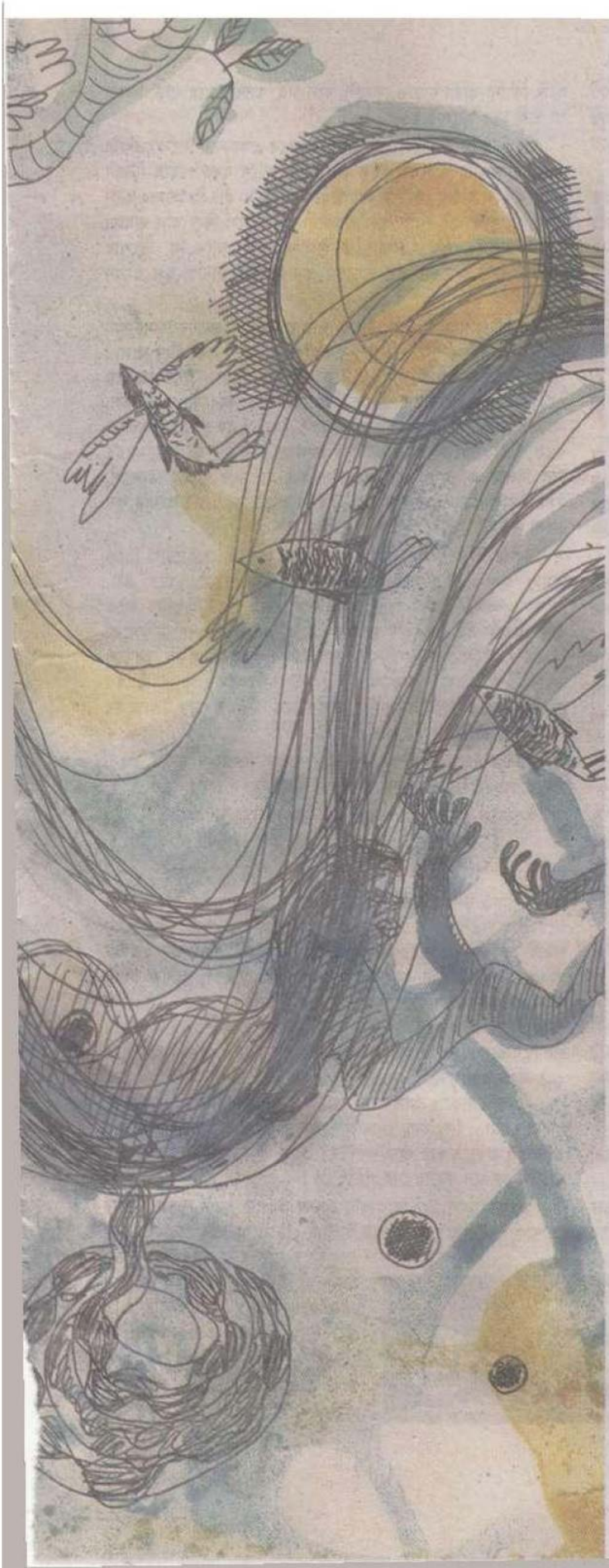

উ প ন্যা স

কবচকুণ্ডল

খুলে পড়ে যার তন্ত্রী

নাসরীন জাহান

আচমকা এক মিহি শিরশিরে বোধ বুকের ভেতর শূন্যতা তৈরি করে। পুরো রাতের জাগরণে কোনো ক্লান্তি ছিল না। সাধারণত হয় না আজকাল এসব; বরং মধ্যরাত চলে এলে মনে হয়, কিছুক্ষণ পরই ধবল আলোর বিস্ফোরণ আঁধারের আচ্ছন্নতা ভেঙে দেবে। তারপরও আজানের পরপরই একেবারে খাঁটি কাঁচা ভোরটাকে জানালার পাশে বিছানায় বসে তারিয়ে তারিয়েই উপলব্ধি করছিল, কিন্তু আলোটা তামাটে দেহের কৃষ্ণচূড়া গাছের ওপর পড়লে, অথবা চোখ-টা, নওশীন দ্যাখে।

এক দুর্মর অসহায়ত্বের মধ্য দিয়ে সে তার বিক্ষত পিঠের শুকিয়ে যাওয়া ঘায়ের মাঝে আর যেন বাঁচার শক্তি পাচ্ছে না। এক ভয়াবহ শেষ আকুতির মতো সে যেন তারই শেষ জানান দিচ্ছে। পর্দা টেনে দ্রুত কক্ষের মধ্যে নিজেকে থিতু করতে করতে নিজ পিঠে নিজে সান্ত্বনার চাপড় দেয়, সবে তো গেল পাতাঝরা সিজনটা, কদিন পরই সুশোভিত প্রাণ হবে, সবুজ হবে... প্রায়ান্ধকার ঘরটির মধ্যে বসে হাতড়ে হাতড়ে ফের জানালার পাল্লা খুলে এই কঠিন ইটপাথরময় নগরীর দিকে চোখ বুজে নাসারন্ধ্র প্রসারিত করে নওশীন, নিশ্চয়ই প্রভাতের কচি গন্ধ পাবে, কিন্তু কিছু আগের জমে থাকা থিকথিকে বোধের মধ্যে বিন্দু বিন্দু রস পড়ে, বৈশাখের যে অত্যাশ্চর্য বুনো ঘ্রাণটা, সেটার একটা ক্ষীণ রেখা আসছে, ধনুকের ছিলার মতো নিজেকে উজিয়ে বায়ুহীন কক্ষ থেকে বেরোতে চায় নওশীন... কাল শেষ রাতের তাণ্ডব ঝড়ে

অলংকরণ : রোকেয়া সুলতানা

প্রকৃতি নওশীনের প্রাণের মতোই বিক্ষিপ্ত, মস্ত এলোমেলো হয়ে আছে। বিড়াল পায়ের কোষে দেহের পুরো ভর দিয়ে মেঝেকে পর্যন্ত নিজের অস্তিত্বের শব্দ না পাইয়ে ঘুমন্ত মানুষদের পেছন ফেলে ছাদ-সিঁড়ির দিকে এগোয় সে।

রাত্রি জাগরণের আলো-আঁধারীর ছককাটাহীন মুহূর্তগুলোয় কত রকম কাণ্ডেরই না অভিজ্ঞতা ঘটে! চারপাশ যত স্থির হতে থাকে দেহে শিথিলতার বদলে অদ্ভুত চাঞ্চল্যের বিস্তার ঘটে। যত স্তব্ধতা বাড়ে ক্ষুদে ক্ষুদে ভাবনাগুলো মস্তিষ্কের মাঝে প্রথমে ঢোকে ঘুণ হয়ে... ক্রমে ক্রমে ব্যাপকতা প্রকাণ্ড অজগরের রূপ নিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে নিজ ভারে তাকে নুব্জও করে না, গিলে খেয়ে শান্তও করে না, এক অশরীরী হুল দিয়ে একের পর এক ছোবল নয় যেন গোত্তা দেয়, যতবার গোত্তা, ততবার একটি ক্ষুদে ভাবনায় ফুলে ফেঁপে রীতিমতো প্রলয়ঙ্করী বিস্ফোরণ।

বেশির ভাগ রাতেই জৌলুসময় বাহ্যিক কোনো ঘটনার উদ্ভব হয় না আজকাল।

আগে হতো, নওশীনকে যখন ঘুমন্ত চোখ কচলে রাত্রি জাগতে হতো। একসময় ঘুমিয়ে পড়লেও এক অদ্ভুত টেনশন তার স্নায়ুকোষকে জাগ্রত রাখত, যেন বা কেউ চাবুক মারবে, আর মুহূর্তমাত্র প্রতিহত করার সুযোগ পাবে না সে। কী যে বিভ্রমময় স্বপ্নের মধ্যে পলায়নময় দিনগুলি গেছে! যাচ্ছে এখনো তবে স্তরে স্তরে রকম পাল্টেছে।

আজীবন তাড়া করা পূর্ণিমার ভূতটা মাঝে যেন ঝিম মেরেছিল। কেন যে আজকাল মাঝে মধ্যে এমন ছায়া করে গ্রাস করতে শুরু করেছে তার অস্তিত্ব, নওশীন হাঁসফাঁস করে সিঁড়ি টপকায়।

এ এলাকার এ বাড়িটাতে দীর্ঘদিন ধরে তারা আছে। দেখতে পাড়ার মতো হলেও শহুরে স্বভাবে যে যার মতোনই অচেনা। বেশ অনেক আগে এমনই এক ঝড়-তাণ্ডবের মধ্যে যাত্রী ছাউনির ভিড়ে দাঁড়িয়েছিল সে। ঘেয়ো ক্লিষ্ট মানুষের দেহ থেকে ভাপ দিয়ে ওঠা বীভৎস গন্ধে নিঃশ্বাস যখন বন্ধ অবস্থা একটি বাস এসে দাঁড়ায়। ভিড় ঠেলে চেপ্টানো পায়ে পড়ে যতবারই সে বাসে উঠতে নেয় গা জ্বালানো ভিড়ের স্রোতে, ততবারই আরও ততদূর পিছিয়ে যায়। তখনই শুরু হলো ভয়, তার প্রবৃত্তির রোগ তাকে গ্রাস করতে শুরু করল, সে যতই পা বাড়ায়, ততই সে ঠিকঠাক জেনে যেতে শুরু করে সে এই বাসে কখনই ওঠার শক্তি পাবে না। নিজের এই বেহাল অবস্থা নিজের কাছে ভয়ঙ্কর উঠতে থাকলে সে একেবারে ভিজে পাখপাখালি হয়ে ঠিরঠিরে কাঁপনের মধ্যে ক্ষীণ দূরের গর্তের মধ্যে জল ফোটার বিস্ফোরণ দেখতে শুরু করে... ধেয়ে আসে শহরতলী... কলকাকলী.. আয় বৃষ্টি ঝেপে।

কখন যে বৃষ্টি থেমে গেছে ঠাহর নেই, সান্ধ্যনগরীতে হাজার রাত্রির হুজ্জোত জ্বলতে শুরু করলে সে একটি হাতের টান টের পায়, মা-গো মহিলার গায়ে কী জোর, ওকে টেনে ভিড় ঠেলে কীভাবে যে নিজের কিশোর ছেলের পাশে বসিয়ে দেয় ঘটনার হতবাকতায় নওশীন ঠাহর করতে পারে না।

গামছা দিয়ে নওশীনের দেহ মুছিয়ে দিতে দিতে বলে, কী গো মেয়ে, তোমার কী হইছে? শরীল ঠিক আছে তো?

আধবয়সী পোড়াটে ফর্সা নারীর মুখের খাড়া নাকটিই তার দৃঢ়তার সাক্ষ্য দেয়, চোখভর্তি অপার মায়া আর উদ্বেগ, নিজেকে ধাতস্ত করতে করতে পর্যবেক্ষণ করে নওশীন নিজের অবস্থানকে পোক্ত করতে কী করে ক্ষণে ক্ষণে সেই নারী বাসের পুরুষগুলোর সঙ্গে প্রয়োজনবোধে লাড়ে যাচ্ছে।

শরীর ঠিকই আছে, কী এক ঘোরে বলে যায় নওশীন, আসলে ছোটবেলা থেকেই এ এক রোগ আমার, মানে কী, হঠাৎ কোনো কারণ ছাড়াও তোতলা বনে যাই, ভ্যাবলা হয়ে পড়ি, জিহ্বা পা ভারী হয়ে আসে।

এই ভিড় ঠেলে গায়ে পড়ে ভিজে জবজবে একজনকে বাসে তোলার ব্যাপারটা বাসের মানুষের পছন্দ হয় নি, তারা যে যখন পারছে টিপ্পনি দিতে থাকলে মহিলা কোমরে আঁচল গুঁজে দাঁড়ায়— হ্যাঁ হ্যাঁ আমার বইন লাগে, যা খুশি তাই লাগে আর একখান কথা কইলে কিন্তু বাস থামায়া পুলিশ ডাকুম। ফের হট্টগোল। মহিলা তা গ্রাহ্য মাখে না, কিশোর ছেলেটি এখন হ্যান্ডেল ধরে দাঁড়ানো, সে আকুতি জানায়, চুপ করেন আম্মা।

ছেলেটির শ্যামলা মুখের দিকে তাকায় নওশীন, অনেকটা মুনিয়ার বয়সী। মহিলা নওশীনকে ফিসফিস করে বলে, এসব কথা ধীরে বলো। পরক্ষণেই প্রসঙ্গ পাল্টে নামধাম ধরে এগোতে এগোতে উচ্চকিত হয়ে ওঠে তার কণ্ঠ, আরে যে গলিতে তোমরা থাকো, তার মুখের একতলা বাড়িতে আমরা থাকি। এরপর যেন আজব কুহকে নিজের মতো গুমরাতে থাকে, এ কিসমতের যোগ, এইটাই আমারে টানছিল, নইলে তুমারেই টান দিলাম ক্যান? পরক্ষণেই উচ্চকিত হয় কণ্ঠ পুত্রের উদ্দেশে, ইসমাইল, স্ট্যান্ডে আসলে বইলো, এইসব কন্ডাক্টারের ওপর আমার কুন ভরসা নাই।

এরপর ছিন্নভিন্ন অনুভূতি, রিকশার মধ্যে তিনজন চেপ্টাচেপ্টি ভিড়ে বিমূঢ়, ভাঙা রাস্তায় মাটিগুলানো ছিটকে ওঠা পানির উপচে উঠা, বিশেষত নওশীন ভেজা শাড়ি, ল্যাপটানো দেহে ঠোঁট কাঁপুনির মাঝে বাড়ি ফিরলে কী বাস্তবতার মুখোমুখি হবে, এই ভয়ে যখন রীতিমতো হিমায়িত, মহিলাদের ফিসফিস করে, এইসব কুনো রোগ না, আসলে তুমার ওপর তেনারা ভর করে, এর উপশম আমার জানা আছে। সোডিয়াম বাতি চুইয়ে আলো নয়, জল পড়ছে। বিস্মিত চোখ উত্থিত হয় নওশীনের, ভর? কী ভর করে?

যেন চারপাশ প্রকম্পিত হয় এক সশব্দ ফিসফিস চু...উ...প... মাগরিবের ওয়াক্তে তেনাদের নাম নিতে নাই।

ইসমাইল কাঁদো কণ্ঠে বলে... চুপ করেন আম্মা, ডর করে।

২

প্রভাতে সিঁড়ি টপকে ছাদে উঠে মিহি তাজা বাতাস সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে শুষে নেয় নওশীন। ধীরে ধীরে ইট গ্রিলে অস্তিত্ব ঠেসে গেলে যেন শতাব্দীকাল পর সে সূর্যের মাড়ি দাঁত দেখে এবং মিহি শব্দে প্রবাহিত ইট পাথরের নগরীতে তার একফালি আভা শত টুকরো লাল, তরমুজ ফলার মতো এমনভাবে চারপাশে ছিটাতে থাকে নিষ্ফল চেয়ে থাকে সে। ঠায় চেয়ে থাকতে থাকতে অনুভূত হয় মুহূর্তে চারপাশ থেকে সমস্ত জাগতিকতা অপসৃত, একটি মাত্র রঙে একীভূত হয়েছে, শাদা। ঘাই দিয়ে ওঠে নবজাতক মুনিয়ার দেহ... অলৌকিক এক রশ্মির মধ্যে ওর দেহ দোল খেতে থাকলে আসমানের মতো দু'বাহু উদ্বাহু হয় শফিউলের, মুনিয়া... আ... নিষ্মু নিষ্মু সোনাজাদু আমার। প্রগাঢ় গভীরতায় নিজের অস্তিত্বেও জড়াতে চায় ওকে নওশীন... কিন্তু এ কী তার বুকের মমতার দাউদাউ আগুনে কন্যার দেহ পুড়ছে যে?

আচমকা দুলে উঠে আকাশটা যেনবা কাঁপতে থাকে নক্ষত্র...' ধূসর পোশাক পরা মেঘ ডানা ঝাপটে ইতস্তত ছড়িয়ে পড়ে যেখানে সেখানে। এবং রঙ ছড়াতে থাকা সূর্য যেন সোনালি মেঘের স্তূপ... একটু বাতাসেই দই হয়ে ভেঙে ভেঙে পড়ে। রেলিংয়ে কঠিনভাবে ঠেসে নিজেকে ধাতস্ত করে নওশীন।

ন...ও...শীন... যেন পাতাল থেকে ডাক আসে। হতচকিত নওশীন চারপাশে তাকিয়ে অস্ফুটে নিজেকে

জিজ্ঞেস করে, শফিউল কি উঠে গেছে ? পরক্ষণেই সূর্যের বয়স দেখে আশ্বস্ত হয়, কৃষ্ণচূড়াটার দিকে তাকায়, সাধারণত এর ডালপালা পত্রপল্লবে একবারে চারপাশ প্রসারিত হয়ে ছাদের ওপর ঝাপটে পড়েও মজার আছারি-বিছারি খায়, এইবার শেষ শীতে পাতা ঝরার সময়টাতে হাজার রকম বৈদ্যুতিক লোকেরা এসে একে কুপিয়ে কেটে নিশ্চিহ্ন করার অভিপ্রায়ে কুড়াল চালিয়েছিল এরপর। ভাগ্যিস শব্দ পেয়ে মুখ বাড়াতেই দেখেছিল হাঁপাতে হাঁপাতে এগিয়ে আসা কুসুমকে... আপা খুন হয়া যাইতাছে... ওর এই কথার প্রাবল্য সদালাপী নওশীন গেটের বাইরে গিয়ে কিছু মুহূর্ত হাঁ হয়ে দেখল দৃশ্যটা, লোকটার যেন জন্মের শত্রুতা এই বৃক্ষটির সাথে, তার কোপের মধ্যে এমন ফালাফালা ক্রোধ দেখে মনুষ্য মনের অবদমন প্রকৃতির ওপর কোপাতে দেখে, এদের জীবন-মন সম্পর্কে ফের সচেতন হয় নওশীন, এরা নিজের ভেতর যা যা অশান্তি ক্ষোভ কী অসহায়ত্বে ঢেকে রাখলে সুযোগ পেলে এর কেমন বহিঃপ্রকাশ ঘটায়, দ্যাখে, সত্যিই যেন ডাল কাটছে না, খুন করছে, খুন করে ফালা ফালা করে লবণ লাগাবে, তামাটে লোকটার ঘর্মাক্ত সঞ্চালিত দেহের মধ্যে এই তাণ্ডবেরই তেজ। আচমকা চোখ পড়ে পাশেই দাঁড়ানো এ বছর কিশোরী থেকে তরুণী হওয়া হালকা গড়নের কদমগাছটির দিকে... এ বছর সদ্য কুঁড়ি আসবে আসবে ভাব ছিল গাছটির সমস্ত মুখরতায় আর এ নিয়ে রোজ রোজ কীযে অনুভবের রোমাঞ্চ নওশীনের দেহে। ও গড! নিজ বাড়ির সামনে থোকা থোকা কদম ফুটবে ? বাড়ির পুরো হাওয়াই যাবে পাল্টে... আর মুঠো মুঠো কদম নিজ ঘ্রাণে ভরিয়ে অদ্ভুত এক নস্টালজিক আবেগে সাজিয়ে রাখবে ফুলদানিতে। কী সাংঘাতিক হবে এই বোধ। এসব স্বপ্নকে খানখান করে দেয়ালে বসে এক ছেলে কুড়াল দিয়ে ছিটকে ফেলে দিল ফুলসহ ওর মুণ্ডুসহ ঝাড়টি...। ওকে থামাতে চিৎকার করে গলা ফাটিয়ে রাস্তায় মানুষ জড়ো করে ফেলে নওশীন, এই ব্যাটা তুই মানুষ ? মানুষ এইভাবে কোনো গাছ কাটে ? এই পর্যন্ত ক'টা খুন করেছিস? তুই আমার কদমগাছের গলা কেটে দিলি ? কুঁড়িগুলোর স্বপ্ন উড়িয়ে ফেললি ?তুই নেমে আয় তোকে আমি এমন করে কাটব, তখন বুঝবি কাটার কষ্ট কী... এইসব বলতে বলতে যখন ঝরঝর করে কাঁদছে নওশীন এবং মানুষদের উদ্দেশে বলছে, আপনারা দেখেছেন কাণ্ডটা ? আমি আরেকটু পরে এলে কী সর্বনাশ হতো আপনার বুঝেছেন ? গোড়া থেকে সবগুলোকে নিধ্বংস করে দিত... এসব বলতে বলতে নওশীন দেখে, সবার চোখে এমন গভীর বিস্ময় নওশীনের হাহাকারের বিষয়বস্তু নিয়ে, যেন সে অন্য গ্রহ থেকে এসেছে।

মৌটুসির কাঁধে হাত, আম্মু আসো ভেতরে আসো, পরিস্থিতি সামলায় সে এবং লোকটাকে ধমকে নামিয়ে লোকজনের উদ্দেশে বলে, আসলে এই গাছটি আম্মু নিজে লাগিয়ে বড় করেছেন, এর প্রতি তার মায়ার ব্যাপারটা আপনারা বুঝবেন না। আপনারা যান।

কৃষ্ণচূড়া আর কদমগাছটি আহত অবস্থায় ক্ষত নিয়ে নিয়ে শুকিয়ে যেতে থাকলে প্রত্যাশায় ছিল নওশীন, আবার ডাল গজাবে... আবার... কিন্তু পাতা ঝরে পড়ার পুরো সময়টায় কতদিন যে বজ্জাতের মতো ন্যাড়া হয়ে পড়ে রইল, তার হিসেব নেই। এরপর বহুদিন ছাদে আসে নি সে, নিজ নিমগ্নতার ধারের কাছেও আর ঘেঁসতে দেয় নি ঘরের বাইরের জগতকে। মাঝে দেখেছে পাতা ফুটতে, কিন্তু তাকায়, তাতে ফুল কই ?

ডিভানে হেলান দিয়ে বই পড়তে পড়তে কী এক ফোঁটা তন্দ্রায় পড়েছিল ? সহস্র স্রোতের ফেনা চারপাশে দেখল, পয়লা ওর মধ্যেই হুটোপুটি খাচ্ছিল মুনিয়া, মৌটুসি দিনে দিনে মেঘ উড়নচড়ের মতো ওদের সাথে লাফাচ্ছে। এই স্বাভাবিক দৃশ্যটার মাঝেই আচমকা একটি সিমেন্ট গাছের মতো দরজা-জানালাহীন ইয়া বড় এক শ্যাওলা পরা সিঁড়ি দৃশ্যমান হয়, নওশীন হিম হিম হয়ে সেই বিশাল আকৃতির বিল্ডিংটা থেকে মাথা গলাতে গিয়ে বোধ করে বেশিটা এগোনোর ফলে সে ভারসাম্য হারিয়েছে, নিচ থেকে চিৎকার করে মৌটুসি, আম্মু পেছনে যাও... যাও... ভয়ে কলজে শুকিয়ে বরফ হলেও নওশীন নিজেকে পেছনে ধাবিত করতে থাকে, কিন্তু মৌটুসি অমন নিষ্ঠুর চোখে তাকিয়ে কীসব বিড়বিড় করছে ? একদম ইসমাইলের মা'র মতো একাগ্র ভঙ্গি, যে নওশীনের বালামুছিবত দূর করার জন্য করত... তার চোখে স্থিরতা থাকত, কিন্তু মৌটুসির চোখে ক্রমশ দানবীয় মুনিয়া—তোমার কন্যা! আমি তোমার কেউ না... উল্টা সূরা পড়তে থাকে সে, মুহূর্তে চারপাশে কী প্রলয়ঙ্করী তাণ্ডব শুরু হয় জানে না নওশীন কেবল অনুভব করে সে শূন্য থেকে ছিটকে পড়ছে, ধড়ফড় করে কেঁপে সামনে চোখ মেলেই দেখে সামনের সুইচ অফ করা টিভিতে সমুদ্রের আছড়ে পড়ার দৃশ্য চলছে।

কিসের সাথে কী যোগ, কেন যোগ এসব ভাবতে ক্লান্তবোধ করছিল সে। কিন্তু যা হয়, ক্ষণে ক্ষণে ওই অহেতুক মহিলাটার ভাবনা ব্যাপক হয়ে উঠছিল।

ছাদে এসে একফোঁটা নির্ভার বোধ করলেও কৃষ্ণচূড়া আর কদমটার দিকে তাকিয়ে বুক ভারী লাগে, জীবনের নানা বিবর্তনে বাঁকে নানা অনুভবে প্রায়ই যা উচ্চারণ করে সংসারের বিরাগভাজন হয় সে সেটাই বিড়বিড় করে, কিছুই থাকবে না আর... এরকম থাকবে না।

অদ্ভুত আশাময় আতঙ্কে যেন ফিসফিস করে মুনিয়ার ধ্বনি... এভাবে বলো না... ভয় লাগে... থাকবে... সব থাকবে।

পর মুহূর্তেই নিজেকে টেনে তুলতে মাথা ঘুরিয়ে অনুভব করে যেন অলৌকিক স্ট্রি দিয়ে কেউ শুষে নিল বুকের সমস্ত ভার, কাঠফুলগাছের কোমরে বাসা করা গাছে আজ নীল টোনা আর টুনি চক্রাকার হুজ্জোতের মাঝে অন্য এক কিচমিচ ধ্বনি... নওশীনের পায়ের তলায় তরঙ্গ বয়ে যায়, বুকের ধরক চেপে সন্তর্পণে হাঁটে... মাগো.. খাঁচার ফোঁকড় থেকে কী সুন্দর মুখ বাড়াচ্ছে সদ্যফোটা বাচ্চারা... আর ? এরা কবে জন্মাল ? ছাদে কুসুমের মুখ, আপা আপনি এইখানে ? ভাইজান ঘুম থাইক্যা উঠছে, বলে সে খাঁচার দিকে তাকিয়ে নিজেও তাজ্জব, আরে ? বাচ্চা কখন ফুটল ? আপা ? আপনি কি ঘুম থাইক্যা টের পাইয়া আইজ ছাদে আইলেন ?

দাঁড়া পরে দেখছি... শফিউলের জাগরণের শব্দে সে অন্য মানুষ। ছুটতে ছুটতে নিচে যায়।

৩

সকালের প্রাত্যহিকতা সামলে সবাই যখন যার যার কর্মক্ষেত্রে চলে গেলে নওশীন একসময় দুপুরে হেলান দেয়। হেলান কি দেয় ? এক অদ্ভুত ছটফটানির মুখে ছিটকিনি এঁটে আজ সে বহুদিন পর সকালে শফিউলের সাথে বসে নাস্তা করছে। মৌটুসি ক্লাসে, শফিউল অফিসে, কিন্তু যখন শফিউল বাথরুমে, কাণ্ডটা ঘটে তখনই, টিএন্ডটিতে একটা ফোন আসে, একটি নারী... কণ্ঠ ফিসফিস তরঙ্গের আবহে তার অবস্থা ঠাহর করা যায় না, হ্যালো।

নওশীন উত্তর দিতে লাইনটা ধরে থাকে কিছুক্ষণ, পর পরই যেনবা ঝপাৎ শব্দে ফোন রেখে দেয়। ফোন সংক্রান্ত এমন মামুলি ব্যাপার নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে পরক্ষণেই ভুলে গিয়েছিল নওশীন। কিন্তু নাস্তার টেবিলের দিকে সে এগিয়ে গেলে ফের ফোন আসে... ততক্ষণে শফিউলের হাতে রিসিভার, আর মৌটুসির তাড়া দেখে যখনই পাউরুটিতে দ্রুত বাটার লাগাচ্ছে নওশীন তখনই শফিউলের অদ্ভুত ভঙ্গির বিচিত্র কণ্ঠের দিকে তার কান গেঁথে যায়, কবে ? কীভাবে ? হ্যাঁ আমি মোবাইল বদলেছি... ঠিক করে বলো তুমি এখন কোথায় ? এরপরই যেন জাগতিকতার হুশ হয় তার। সে যেন ছটফট করে তাকায়

ডাইনিং টেবিলের দিকে, তার কণ্ঠ নিম্নগামী হয়। কিন্তু প্রথমে মাথা তাক করলেও স্নায়ুর ভাঁজে কী জানি কী টের পেয়ে না অথবা পেয়ে নওশীন ব্যাগ হাতে চেয়ারে নেতিয়ে থাকা মৌটুসিকে তাড়া দিয়ে দাঁড় করানোর চেষ্টা করে, অন্যদিকে সন্তর্পণে দেখে কণ্ঠ নামানো শফিউলের বিচলিত মুখ...। ফলে যখন ডাইনিং টেবিলে এসে বসে শফিউল, এক আত্মঘোর আচ্ছন্নতার মধ্যে, জিজ্ঞেস করে নওশীন, কার ফোন ?

পরক্ষণেই অনেকদিন পর নিজেকে লুকিয়ে 'সবকিছু ঠিক আছে' শফিউলের চেহারাকে মুহূর্তে স্বাভাবিক করে ফেলার দক্ষতাটা দ্যাখে, অফিস থেকে ফোন এসেছিল, ছোট একটা ঘাপলা হয়েছে, আজ জলদি যেতে হবে... বলতে বলতে সহজ হাসিমুখে লটকে মৌটুসির গালে চাপ দেয়, ঘুম কাটে না বুঝি ?

ঘুম না... আব্বু... প্রমিজ বলছি, শরীর খারাপ লাগছে।

কম্পিত হাতে টোস্টে কামড় দেয় টানা ঝিম মেরে থাকা মুনিয়া, কী যে ফাঁকিবাজ হয়েছে আব্বু, ওকে ইশানের মতো আমির খানের হোস্টেলে পাঠিয়ে দিলে বেশ হয়। উত্তরে ওদের খিটিমিটি ভাঁজেই হুড়মুড় করে নাস্তা গিলতে থাকা শফিউলের দিকে তাকিয়ে খটকাটা কেন যে ঝাড়তে যায় নওশীন, নিজেই বুঝে না, কী আশ্চর্য মোবাইল বাদ দিয়ে টিএন্ডটি ফোন ?

এইবার হীন চোখ শফিউলের, কন্যাদের ছাপিয়ে বিদগ্ধ করতে চায় নওশীনকে, টিএন্ডটিটা সারেন্ডার করে দিই ? এ ফোনের যদি দরকারই নেই, মাসে মাসে বিল গুনে কী লাভ ? গজগজ করতে করতে পানি গিলে শফিউল এবং এরকম মুহূর্তে তার সহজাত স্বভাবে একটু স্থির হয়েই যেন কৈফিয়ত দেয়, মোবাইলটা ওপেন করতে সকালে ভুলে গেছিলাম। ওরা বন্ধ পাচ্ছিল।

এরপর থেকেই আচাভুয়ো অদ্ভুত এক দৈত্যের মতো ছায়াটা নওশীনের কাঁধে ভর করে।

উলকাঁটা দিয়ে সুয়েটার বুনতে বুনতে অনেক খুলেছে, মাকড়সার মতো অধ্যবসায়ের লড়াইয়ে অনেকবার প্রাসাদের ওপর উঠতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে খেয়ে পড়েছে, এখন এই নিস্তরঙ্গ জীবনে স্থবিরতা আর একঘেয়েমিতে যতই বমি উঠতে থাকুক গলায় জাগতিক বিন্যস্ততার গড়ে ওঠা জীবনে যে আশঙ্কা ঘাই দিয়ে উঠছে সেই যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার শক্তি সাহস কিছুই আর তার নেই।

তুমি এখন কোথায় ? কবে ? কীভাবে ? শফিউলের এই শব্দাবলীর শিখা কানে বিচ্ছুরিত হয়ে ডানা মেলতে থাকে। এ কিছুতেই অফিসের কারও ফোন না। তবে কার ফোন আসার আসায় এতকাল পর শফিউল আচমকা খেই হারানোর মতো বিপর্যস্ত হলো ? আর তার এই শুষ্ক বিক্ষিপ্ততায় রীতিমতো মটকা মেরে থাকা নওশীনের কোষের মধ্যে এমন শিরশিরানির হিম ঠান্ডা বয়ে গেল যে ? এদ্দিনের গড্ডালিকায় ভাসা আটপৌঢ়ে জীবনে এমন কী কুহকের ডাক আসতে পারে, যাতে ভয় পাচ্ছে নওশীন ? কেন একটি সামান্য কেজো ফোনের উত্তরে শফিউল তার সহজাত হা হা... অট্টহাসিময় কণ্ঠটার শ্বাস বন্ধ করে নিজে সাবধানী হয়ে উঠল ?

নওশীন... নওশীন... এ তোমার ভুল, তোমার ব্যারাম, তিলকে তাল করা, পিণ্ডকে পৃথিবী বানানো, বীজকে ভাবনায় দুঃসহ পীড়নে কচলে কচলে বীভৎস বানানোর রোগ... পিঁপড়েকে অজগর হতে দিও না...এই ভাবতে ভাবতে... যখন নওশীন অনুভব করল যেন সত্যিই একটি ঠান্ডা কোনো অবয়ব পা থেকে কুণ্ডলী পাকাতে পাকাতে তার সর্ব অস্তিত্বকে কব্জার মধ্যে নিতে চাইছে... দু'কান চেপে অস্ফুট আর্তনাদে সে ছটফট করতে করতে সর্ব অস্তিত্ব থেকে যেনবা কঠিন নিজস্ব শ্যাওলা খসাতে চায়.. না, আমি এটাকে প্রশ্রয় দেব না। এ আবার আমাকে ধরতে শুরু করেছে, এ আমার স্নায়ুর বিভ্রম...। জানালার পাল্লা খুলে দুপুরের খাঁ খাঁ রোদে বাতাস খোঁজে সে।

রোদের ভাঁজ ভরে বাতাস আসে না... কিন্তু ওর ঝাঁঝে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অনেকটা নির্ভার বোধ করতে থাকে সে। চক্ষু যত বিস্তার করে সেই গনগনে আলোর ভাঁপে ততই তার ধাঁধানো রঙের মধ্যে আজব সব রঙের চাকতির ভুমোডামা চক্র তৈরি হয়, যত স্থির নওশীনের চোখ তত ছায়া মায়াময় হাজার রঙের বিভ্রমের তাপ দেহে এসে ভর করে, ফলে এতক্ষণ ভাবনার ঘোর ভার দেহাত্মায় যে শৈত্যপ্রবাহ তৈরি করছিল তা কেটে যেতে থাকে... একসময় আশ্চর্য... কোনো রঙ নেই, কেবল একটি ছায়া, কুসুম এসে দাঁড়ায়, ওই রোদ ছায়ার মাঝে ঠায় তাকিয়ে থেকেও নওশীন স্নায়ু নিয়ে তার উপস্থিতি টের পায়, মুহূর্তে তার এই প্রক্রিয়াগুলোকে কব্জায় আনতে পারার সহজাত দক্ষতায় সে এক লহমায় সামনের বিস্তীর্ণ আবহকে গিলে ফেলে সহজ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, কিছু বলবি ?

টেবিলে ভাত দিমু ?

জানালা থেকে নিজেকে ঘুরিয়ে নওশীন বিছানা থেকে নিজেকে মাটিতে নামায়... কণ্ঠের মধ্যে এক রগরগে তরঙ্গ এনে জিজ্ঞেস করে, এক বেলা না খেলে কী হয় ?

সেইটা আপনিই বেশি ভালা জানেন, কুসুম হালকা ঠোঁটে হাসে; আপনি কোন বেলার খাওন যে কোন বেলা খান... কখন না খায়া থাকেন... কখন কী যে ভুলেন, কখন মনে রাখেন...। কী যে আপনার মধ্যে অয়...।

তোরও মনে হয় আমার মাঝে কিছু হয় ? তুইও তার কিছুটা আঁচ টের পাস ? যতই বুজরুকির ভং দিয়ে নিজেকে মুখর করে রাখি, ততই মনে হয় তুই বুঝিস আমিও তোরই মতোন, এর চেয়ে আলাদা উচ্চতা আমার নেই... আলাদা আড়াল নেই তোর কাছে... রহস্য নেই... তারপরও তুই ঠিকই আমার অবিশৃঙ্খলাটা দেখতে পাস, যা-কে আমি নিজের মতোন করে কঠিন অধ্যবসায়ে শৃঙ্খলা নাম দিয়ে জুত করে বসেছি ? এই জুত-এর মাঝের বেদনা ভাঙন দেখতে পাস তুই ? কিছু হলেও ? এক ফোঁটা ? ভেতরে এইসব প্রশ্নের কুণ্ডলী নিয়ে উন্মুখ হয়ে তাকায় কুসুমের দিকে... ধীরে ধীরে স্থিত হয়, কী যেন রান্না করতে বলেছিলাম ? কই মাছের সাথে শিমের বিচি, কাচকি মাছের দোপিয়াজি, ইলিশের মাথা দিয়া কচুশাক...।

ওসব এখন থাক। শুকনো মরিচের সাথে কয়েকটা কাঁচামরিচ চটকে দে, আজ আমাকে ঝালের নেশায় পেয়েছে।

আপনি মরবেন...রীতিমতো গজগজ করতে করতে হাঁটে কুসুম... কালকেই পেট ব্যথায় চিল্লাইলেন। ক্যান যে ভুইল্যা যান!

এ একটা কথা বলেছিস বটে... নওশীন ফিনিক্স পাখির মতো উড়ন্ত হয়, এ কোনো বাক্য নয়, এ যেন মহা জীবনের এক অমোঘ বাণী দিয়ে গেল কুসুম...নওশীন কথাটিকে খপ করে ধরতে চায়... যত ধরতে যায় তত যেন সেই কথা কোনো এক মহাবলয় থেকে বেরিয়ে আসা কোন আলোর ফালিতে পরিণত হয়—হ্যাঁ, ভুলে যাই, ভুলে যেতে পারি বলে নিঃশ্বাস নিতে পারি, একই ভুল আবার করি... করে টিকে হোঁচট খেয়ে কিছু শিখি, পুরোটাই যদি একবার ভুল করে শিখে যেতাম তো এই শিখে যাওয়া ভুল না করা অস্তিত্বটাকে গাছ বানিয়ে কোন মাটিতে পুততাম ? একটা পর্যায়ে যার বিস্তার রোধ হলে সে তার অসহায় ডালাপালাগুলো নিয়ে কী করে জানত কী করে প্রস্তর হতে হয় ? মানুষ নিজেকে অসহায় জেনে অসহায় মেনে কোনো একটি মুহূর্তও কি এক কদম

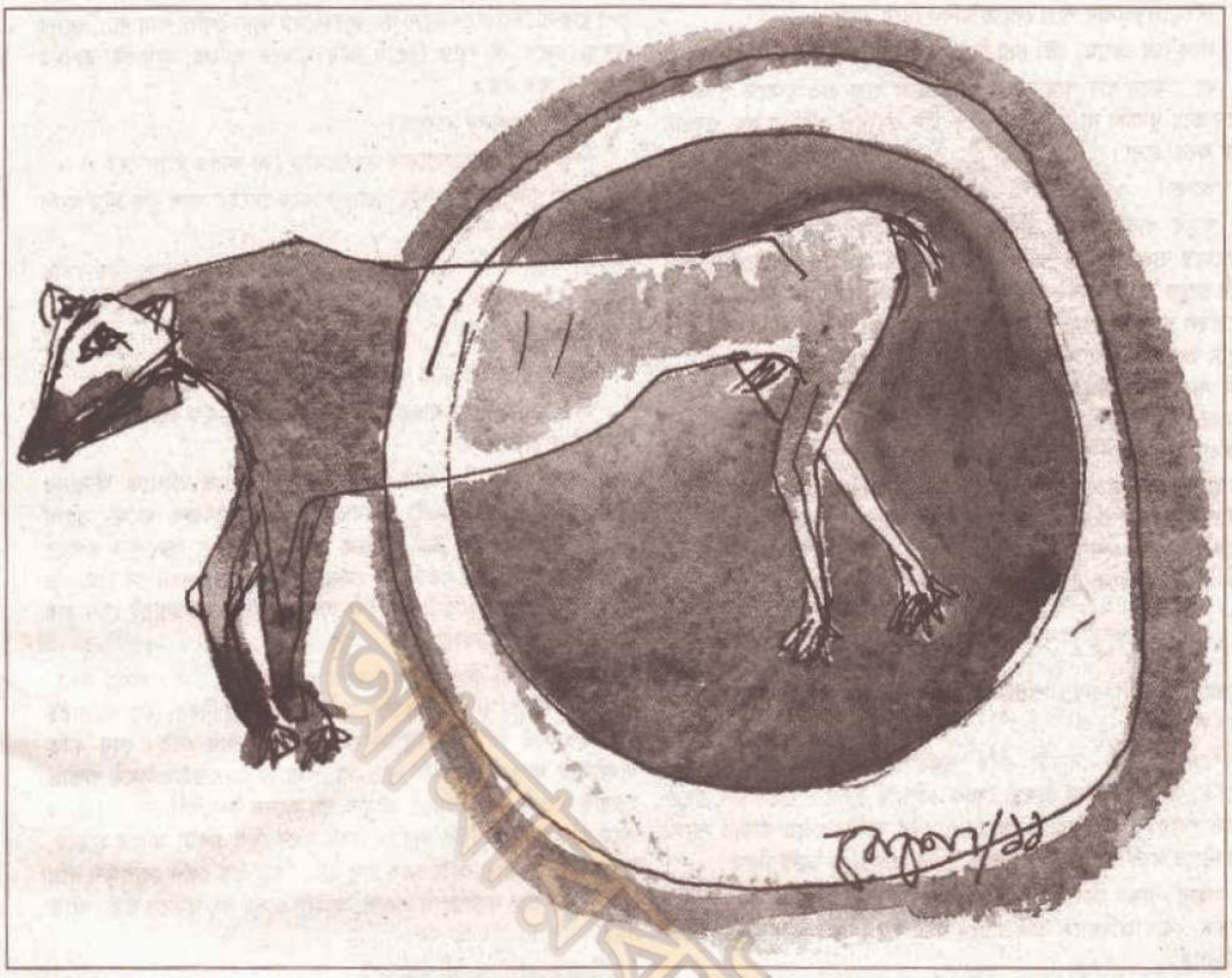

সামনে বাড়াতে পারে ? মানুষ জানে, তা সে পারে না। তোমাকে কে বলল মানুষ জানে না ? মুহূর্তে নওশীনের অপর সত্তা ঘুম ফুঁড়ে উঠতে থাকলে তাকে সবেগে টপকে কুসুমের ছেড়ে যাওয়া সেই বাক্যের অদৃশ্যে ঝাঁপ দেয় নওশীন, আজকাল ভুলি না, যা যত ভুলতে চাই তত বিকট হয়... আমি আমার মাথার বাতিটাকে বন্ধ করে ঘুমাতে চাই রে একফোঁটা... নওশীনের চোখে জল এসে যায়।

৪

অবসাদে নুয়ে পড়ে। রাত্রি জাগরণের ধকল দেহ আর বইতে পারছে না... চোখ দুটো জ্বালা জ্বালা করলে দু'পাপড়িকে কষে বাঁধে... পাক খেয়ে ওঠে এক নারী দেহ... যেন 'নেচে ওঠে আদমের সাপ' তার চোখের হাজার মায়াতে নওশীনের কুচিকুচি ভয়... আটপৌরে শাড়িতে পেচানো শরীর শত গ্রাম্য অবয়বের মাঝেও কোথাও নওশীনের মস্ত পরাজয়... তার দেহের সাথে মিশে যাচ্ছে আরেকটা দেহ... নওশীন নিজেকে ছেড়ে দিয়ে দেখছিল দৃশ্যটা কী নাম সেই নারীর ? হরিণীয়া...। কিন্তু সাথে সাথেই পুরুষটির ছায়া মূর্ত হতেই লাফ দিয়ে উঠে বসে সে। হাঁপাতে হাঁপাতে যেনবা বাইরের কুয়াশা ছাড়িয়ে সে ঢকঢক পানি গিলে। টিভি স্ক্রিনের পারিবারিক অতিনাটকীয় ড্রামাতে আশ্রয় খুঁজেও নিস্তার হয় না। ফোন দেবে আবারও শায়েদকে ? বিষয়টা নিয়ে ভাবনার শুরুতে সে এটাকে ব্যাপক হতে না দেওয়ার অভিপ্রায়ে বলা যায় এক নিমগ্নতার মাঝে সে ফোন দিয়েছিল শায়েদকে। তাদের কাজের মেয়ে বকুলি ফোনটা ধরার পরই তার স্থান-কাল-পাত্রের অবস্থান সম্পর্কে হুঁশ হয়.. বেচারা কদিন ধরে জ্বরের তাণ্ডবে পড়ে ভালোই কাবু হয়েছে। এর মধ্যে এমন একটা সন্দেহের উৎপত্তি নিয়ে ওর সাথে কথা বলতে চেয়ে কতটা আহাম্মকি হবে এটা ভেবে বেদম পস্তিয়েছে সে... কিন্তু এই বিন্দুতে এসে আবার ওকেই ফোন করার কথা সে ভাবল সে ? এদেশের অনেক নারীর মতো নওশীনেরও এই বিশ্বাস, নারীর ক্ষত, নৈঃসঙ্গ পীড়ন... সুখ এসবের উপলব্ধি অনেকটা হলে অনেক নারীই করতে পারে। এক্ষেত্রে এখন নওশীনের উপলব্ধি না, কিছুটা নিস্তার দরকার। এক্ষেত্রে শায়েদ এক অদ্ভুত ব্যতিক্রম, জীবন বাস্তবতায় তার যত পাক দুর্বিপাকই থাকুক, সে কথা বলার ক্ষেত্রে কোথায় গিয়ে সর্বোচ্চ চেষ্টা করে একটি নৈর্ব্যক্তিক জায়গায় যেতে, তাতে যতই অপ্রিয়তা থাকুক কোথায় যেন জীবনের বড় একটা জায়গা দেখাতে গিয়ে রোজকার প্রাণের টানাপড়েনের বাস্তবতাকে তুচ্ছ করে দেখাতে পারে সে।

আহারে, এমন অসুখের মাঝেও প্রতিদিনই যাই যাই করে শায়েদকে দেখতে যাওয়া হয়ে ওঠে না নওশীনের। ফের স্রোতে তলাতে থাকলে কী হয় এক দুর্মর টানে ফোন দেয় শফিউলকেই। রিং বাজছে। এরপর শফিউলের ব্যস্ত কণ্ঠ, হ্যাঁ বলো ...

না মানে আসার পথে লেক্সোটানিল নিয়ে এসো।

সবে তো এলাম, এটা তো বিকেলেও বলতে পারতে...।

না... মানে যদি পরে ভুলে যাই ? কাল সারা রাত ঘুমাতে পারি নি, দিনে ভয়ে ঘুমাচ্ছি না... আবার রাতে যদি ওষুধেও কাজ না হয়, ওষুধটা মনে করে এনো।

আচ্ছা।

কুসুম খাবার দিয়ে ডাকছে... আহা শফিউলের কণ্ঠে রোজকার একঘেয়ে ব্যস্ততা... কী শান্তি। ফুরফুরে মুড়ে তলাতে তলাতেই অনুভব করে স্নায়ুর মধ্যে ফিনকি দিচ্ছে অন্যকিছু, সকালে ছুটতে ছুটতে অফিসে গিয়েছিল শফিউল, গড়ানো দুপুরে সে 'সবে তো এলাম' কী করে বলে ? দুপুরে তার কণ্ঠে থাকে আলস্য... এখন কেন হন্তদন্ত মুড ? না নওশীন... তুমি পারবে না, কিছুই আর থাকবে না... তোমার ভেতরের ছায়া ভূতটা তোমাকে কাপড়কাচা করে পানিতে চোবাবে ডাঙ্গায় আছড়াবে... তুমি সাঁতরানোর জল পাবে না উড়ার আকাশে পাবে না... তলায়মান অবস্থাতেই সচকিত নওশীন দ্যাখে, জানালা দিয়ে একটা চড়ুই ঢুকে ফ্যানের বাতাসে পড়ে ছটফট করে চক্কর খাচ্ছে। সমস্ত ছায়ার খোলস থেকে বেরিয়ে নওশীন দুর্নিবার এক তাড়ায় তার আঙুলকে ফ্যান সুইচের দিকে ধাবিত করতে এগোয়।

৫

এইভাবে দিনগুলি যায়। শফিউল ট্যুরে গেলে ফের নিজ বৃত্তে গড়াতে থাকে নওশীন..

আমার ছোট বোনটা শেষ পর্যন্ত মারা গেল এই কিছুক্ষণ আগেই...ক্রমশ বর্তমান অবস্থা থেকে কোথায় তলাতে থাকে সে ঠাহর করতে পারে না। একেবারে আমার চোখের সামনে বেঁচে থাকার সাথে ভীষণভাবে লড়তে লড়তে টকটকে পূর্ণিমা চাঁদটাকে উল্টে দিয়ে।

সহসা প্যাক্কা আঁধার। আমি ঠাহর করতে পারছিলাম না আমার অবস্থান, ঘোর অবিশ্বাসে আঁধার ছিদ্র করে আমি তার অবয়বটা দেখতে চাইছিলাম।

ঠাঠা কাঁঠাল ফাটা রোদে ঠায় একাকী দাঁড়িয়ে থাকা কোন বৃক্ষের দিকে তাকিয়ে থাকলে ক্রমশ চোখের সামনে যেমন তাকে ছায়ার মতোন দেখায়, তেমনি ঘোর আঁধারে আমার সহোদরা বুলবুলি... জন্মের পর থেকে যে ছিল আমারই দেহ আত্মার সাথে যুক্ত... সে ক্রমশ ছায়া।

যেন চন্দ্রের মতো লক্ষ্যচুত আমিও আচমকা উল্টানো... কোথায় লটকে আছি ? বাংলার মাটি বাংলার জল বাংলার বায়ু বাংলার ফুল... পূণ্য হোক..., হে ভগবান ? আমি কোথায় লটকে আছি ? ওরে কে আছিস ? আমাকে খুঁজে বের কর। আমাকে নামা...।

কারা যেন ধরল। ধরিত্রী পাওয়ার পর শূন্যের ইতিহাস ভুলে ক্রমশ এগিয়ে যাই বোনটির দিকে। একেবারে ওইটুকুন ক্ষুদে শিশু মা'র মৃতু। দৃশ্যের সামনে প্রথম আমার কোলে এসে পৃথিবীতে ছিটকে পড়ার বেদনায় কেঁদেছিল। অসুস্থ মা'কে দেখার আমার সময় কই ? আমি কিশোরী অবস্থাতেই ওকে কোলে নিয়ে স্ট্যাচু মা মেরী।

এ আমি বিশ্বাসই করি না খিঁচতে খিঁচতে আমারই সামনে যে নিথর হয়েছে সে মারা গেছে। অবশ্যই সে ঘুমন্ত। আমি প্রতিদিন রাতে কতভাবে তার ঘুমন্ত অবয়ব দেখেছি। আজকে ওর এই চোখ বুজে পড়ে থাকার মাঝে ইহজগৎ থেকে মৃত্যুলোকে চলে যাওয়ার মতো অত ভয়ঙ্কর পাষণ্ড সত্যের ছায়ামাত্র নেই। কিন্তু আশপাশের বিলাপরত নারীগণ, আর থিতিয়ে কাঁদতে থাকা পুরুষজন... জন্মের পর থেকেই বলা যায় যাদেরকে শেখানো হয়, পুরুষদের কান্না শোভা পায় না... ওদের অবস্থা দেখে কী করে বিশ্বাস করি সামনে শায়িত আমারই প্রাণময় সহোদরা মৃত নয় ?

তবে কি অজ্ঞান হয়েছে ?

কিন্তু ওর জ্ঞান ফেরানোর তৎপরতাও তো কারও মধ্যে নেই ?

মরে গেলি তুই ? আমার পরানের সাথে দেহের সাথে যুক্ত হয়ে থাকা অস্তিত্ব তুই খসে পড়লি ?

কী করে এখন আমি হাঁটি ? কী করে এই অনভ্যাস নির্ভারতায় দাঁড়াই ? নিঃশ্বাস নিই ?

আমার গন্তব্য কী ?

একী কলজে পেড়ানো আতরের ঘ্রাণ দাউদাউ চারপাশে!

কী নাড়িভুঁড়ি ছিড়ে যাওয়া বিষাক্ত ধোঁয়া গো ? এ অবস্থায় আমি এখন কীভাবে কাঁথায় পৌঁছাই ?

নিজের মধ্যে বুঁদ হয়ে থাকা নওশীন কাঁপতে কাঁপতে জীবনের একসময় ঘটে যাওয়া এই বাস্তবতাটার মাঝে ডুবজল খাচ্ছে, সহসা ফোনের শব্দে কেঁপে উঠে। নিস্তব্ধ রাতের আঁধারে জানালার ওপারে হাজারো আলোর স্থির জোনাক। মোবাইল কোথায় ? যখন সে হামাগুড়ি দিয়ে খুঁজতে থাকে অস্তিত্বের দুর্বিষহতার পাকে পড়ে ততবারই যেন তার বিভ্রম খিকখিক টিটকারী হাসে।

ইলেকট্রিসিটি গেল কতক্ষণ হলো ? স্মরণে আসে না। কথায় কথায় বাতি চলে যাওয়া বলা যায় জন্মের সাথে যুক্ত একটা বিষয়, কিন্তু যতবারই যায় ততবারই খিটখিটে গ্যাজলানো মেজাজে রাগ ওঠে। যেন বাতি যাওয়াটাই ব্যাপার, থাকাটা না... না... না এ ব্যাপারটার সাথে অভ্যস্ত হওয়াই যায় না। এ বাড়িতে আসার পর অনেক টানাপড়েনের পর ক্রমে ক্রমে শফিউলের আর্থিক উন্নতির সাথে সাথে বেশ একটা আরাম হয়েছে, ইলেকট্রিসিটি গেলে আইপিএস চালু হয়। কিন্তু এত বেশি বেশিক্ষণ ধরে বাতি যেতে শুরু করেছে আজকাল, আইপিএসের দম ফুরিয়ে যায়। আজ সন্ধ্যা থেকে আইপিএস নষ্ট।

ঠিক হওয়ার কোনো নাম নেই।

শরীরে খিকখিক ঘাম জমতে শুরু হলে, বায়ুহীন কক্ষটিতে নাসারন্ধ্রে স্তব্ধতা জমতে শুরু হলে ধনুকের ছিলার মতো নিজেকে উড়িয়ে জানালার কাছে গিয়ে ওর পাল্লা খুলে দেয় নওশীন। আহা! কে জানত এই ইটপাথরময় নগরীতেও কী করে বৈশাখী বাতাসের ঘ্রাণ আসতে পারে ? আসতে থাকে ধোঁয়া বাতাস চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে যখন ঠান্ডা পরশ নিয়ে সহজাত অভ্যাসে নওশীন আলুথালু করে মাটি খোঁজে ও মৃত্তিকা... হে ভৈরব হে রুদ্র বৈশাখ ধুলায় ধূসর রুক্ষ উড্ডীন জটাজাল।

হে তপোস্বিনী নদী ? আমার একফোঁটা গেরাম প্রান্তরের বহু ফোঁটা মফস্বলের ক্ষীণ পথ, হে শৈশবের উড়ানিয়া শিশু আম্র পল্লবের ঘেরান বাঁশি ? উত্তীর্ণ কৈশোরের অলিগলিময় ক্ষীণ পথ তেপান্তর... একী ঘ্রাণ আগরবাতির... বুঁদ হয়ে থাকে নওশীন। ক্রমশ বুকের বরফের মাঝেই ফুরিয়ে যেতে থাকা শাদা মোম আলোর পাশে ফোনে কান পাতে, হ্যাল্লো ?

ঘুম থেকে উঠালাম না তো ?

আরে না... না... তুমি তো জানই রাত জাগি আমি... দম ছেড়ে দেওয়া কণ্ঠে বলে, তো তোমার কী অবস্থা ?

যা রোজ হয়, কণ্ঠে শ্লেষ না ক্রমাগত ক্ষুব্ধতা জমতে থাকার বেগ সামলে হাল ছেড়ে দেওয়া কণ্ঠে সালেকা বলে, পতিব্রতা স্ত্রীর মতো জেগে জেগে সেদিন স্বামীর জন্য অপেক্ষা করছি।

কেন ঘুমিয়ে যাও না নিজের মতো ? কথা বলতে বলতে নওশীন আঁধার ছাড়াতে তৎপর হয়, জেগে থেকে কী পুণ্য করছো ? বেচারা চাকরি করে, বিস্তারের কাজ তো তুমি জানোই, টাইম অটাইমে সাইটে যেতে হয়, মিটিং করতে হয়। তুমি তো জানো। সবকিছু, তো ?

একই ঘ্যান ঘ্যান করে সালেকা, আরে, এই কাজের উছিলায়ই তো স্বাধীনতার পাখা মেলেছে। অন্য কোনো বদ নেশা না থাকলে মানুষ ঘরের টান কেমনে হারায় ?

মাথা থেকে সন্দেহ ঝাড়ো। নিজেরই আরাম হবে, ফোনে হাসি ছাড়ে মৃদু শব্দে, বাদ দাও কী করছিলে ?

স্টারপ্লাসে সিরিয়াল দেখছিলাম। ধুসশালা কারেন্টটা চলে গেল, ভাবলাম তোমাকে ফোন করে সোয়ামী কুত্তাটাকে একটু কচলাই।

তোমার ওখানেও ইলেকট্রিসিটি গেছে ? ভেতর থেকে উত্থিত হওয়া এই প্রশ্নকে ঠেলে সজোরে দাঁড়ায়, নওশীনকেও ফ্রি ভেবে সে এখন বেচারা কর্মব্যস্ত হাজব্যান্ডকে নানা খিস্তি-খেউরে কচলানোর মজায় মেতে উঠবে। নওশীন এখন একেবারে এই মুডে নেই, শব্দ করে অভিনয় করে বলে, দিয়েছিস খাবার ? ও.কে আমি আসছি।

তুমি এখনো খাও নি কেন ?

ব্যস্ত ছিলাম আসলে, ওর সাথে এই বদ্ধ গরমের দমকে যখন আঁতিপাতি করে এইসব ভ্যাজভ্যাজে কথার ফোঁকড় গলিয়ে বাতাস খুঁজতে ভাগতে থাকে, সারাদিন জ্বর জ্বর গেছে, সব কাজ জমে গেছিল, এদিকে মৌটুসিটা কম্পিউটারের সামনে থেকে সরছেই না, ভোরে ক্লাস ওর, এ নিয়েই ভাগাদা দিচ্ছিলাম। নিপাট মিথ্যেগুলি অবরুদ্ধ আত্মাকে খুলতে থাকে, মিথ্যা নয়, শব্দ নয়, যেন বেঢপ একটা অবস্থা থেকে বাঁচতে নওশীন কিছু বলছে... এই বোধের মুখে সালেকার কণ্ঠ আছড়ে পড়ে, কী যে হয়েছে আজকালকার ছেলেমেয়েদের, রাত জেগে ফেইসবুকে প্রেমশিপ, মোবাইলে এসএমএস... এ যে কী বিচ্ছিরি নেশা...।

এই নেশাতে তো তুমিও ডুবে থাকো, বলতে গিয়েও থামে নওশীন, মুহূর্ত মুহূর্ত কথায়, আচরণে স্ববিরোধী এই মেয়েটির সাথে এ নিয়ে তর্ক করা বৃথা... সালেকা বলে... কী ব্যাপার চুপ মেরে গেছ কেন ? ফোনে তো কিছু দেখা যায় না, কিছু না বললে বুঝব কী করে লাইনে আছ কি নেই ?

ওর এই কথাগুলোকে ঝলসে দিয়ে পরানের মধ্যে মস্ত আরামের বাতাস দিয়ে ঝাঁক ঝাঁক বাতি চলে আসে।

ঘূর্ণায়মান বাতাসের নিচে আর একফোঁটা আপোস না, বলে, খিদেয় মরে যাচ্ছি, সালেকা, কাল কথা বলি, ও. কে ?

যেনরা ঠায় দুচোখ দেয়ালে পেতে এরপর পুরোরাত্রি কাটিয়েছে একটি নিঃশ্বাস চেপে। ভোরে প্রকৃতির গায়ে হাওয়া লাগাতেই হুড়মুড় ঘোরে ঘুম ভাঙে। দূর গ্রামের বাতাস ধেয়ে যেন ফোন বাজছে।

নওশীন তুমি কেমন আছ ?

কে আপনি ? আমি ঠিক চিনলাম না আপনাকে।

আমি হরিনিয়া বলতেছি। কী মনে হয় তোমার ? শফিউল আমারে ভুইলা গেছে ?

আমাকে কেন এসব বলছেন ?

তোমারেই তো বলব। সব তো তুমিই তো ছিনায়া নিছ। সংসার সন্তান স্বামী সব আছে তোমার, আমারে একটু পাশে রাখতে এত জ্বালা হইল তুমার।

প্লিজ আপনি যান... যান।

গতরাত ঘুম হয় নি, আজ রাত অবসাদে-শ্রান্তিতে শরীর নুয়ে পড়ছে... জেগে ওঠে একী বিভ্রমময় স্বপ্ন দেখল সে ? শফিউলের অতীতের সেই ভয়ঙ্কর ভয়ের একটা অধ্যায়, যে অধ্যায়কে অনেক কষ্টে ছায়া করে দিয়ে সে এই জীবনের সুখ-দুঃখের জীবনটাকে অতিবাহিত করে গেছে, একে আর উত্থিত হওয়ার সুযোগই দেবে না নওশীন। যে ফোন আসে নি... তাকে ভাবনায় ব্যাপক বানানোর অর্থ হয় না। তার ক্লান্ত অবসন্ন অস্তিত্বের এক ভ্রম ভেবে নিজেকে ঝাড়া দিয়ে সে মুনিয়া-মৌটুসির ঘরে যায়। ওপাশ ফিরে কোলবালিশ বগল দাবা করে বেঘোরে ঘুমাচ্ছে মৌটুসি... ওপাশে মুনিয়া স্থিত শান্ত ওর স্বভাবের মতোই, স্থির শুয়ে আছে, সন্দেহ জাগে ও ঘুমন্ত নাকি জাগরিত অবস্থায় নিজ জগতে বিভোর হয়ে আছে। সন্তর্পণে কাছে যায় নওশীন... সবুজ আলোতে শায়িত মুনিয়া যেন অপ্সরা... যেন সবুজ রঙের ডুমোডুমো হিম ওর চারপাশে ঘুরছে। সস্নেহে ওর কপালে হাত রাখে নওশীন... ফের সেই ভয়ঙ্কর ভয় তাকে কব্জা শুরু করে... দূরবর্তী হচ্ছে মুনিয়া... পাখি হয়ে দিশাহীন দূর দূরে সে চলে যেতে নিলে হকচকিয়ে সে আঁকড়ে ধরে মুনিয়াকে। ঘুম ভেঙে গেলে মুনিয়া অসহায় হয়ে ভয় ভয় চোখে তাকায় নওশীনের দিকে... আম্মু... আম্মু... কী হয়েছে ?

কিচ্ছু না ? ওর কণ্ঠস্বর শুনে প্রাণে আরাম হয়। আমি একটা বাজে স্বপ্ন দেখেছিলাম, তুমি ঘুমাও সোনা... বলে সস্নেহে ওর কপালে চুমু খেয়ে হালকা চাদরটা ভালো করে ওর গায়ে টেনে দিয়ে নিজ ঘরে আসে।

শ্রান্ত অবসণ্নতায় আঁধার নেমেছে।

নওশীন গভীর ঘুমে তলিয়ে যায়।

৬

নওশীন জন্মেছিল এক ছিন্নমূল হতশ্রী পৃথিবীর সামনে দস্তুরমতো পর্যুদস্ত একটি পরিবারে। জন্মের পর একটি শিশু যা যা দেখে যেভাবে সেটাকেই তার পৃথিবীর অংশ মনে করতে থাকে আর কিছুকে না, তেমন স্বাভাবিকতার মধ্যেই বড় হতে হতে নওশীন জানত একটি কক্ষে এক বিছানায় কী বদ্ধ পরমে কী কঠিন শীতে জাতাজাতি করে বোনাদের আবাসন-এর রূপ। তার কাছে কোনো বেলা ভাত... কখনো গুড় দিয়ে রুটি কখনো মিষ্টি আলু সেদ্ধ করে খেয়ে বড় হওয়াটাই পৃথিবীর সব মানুষের খাদ্য অবস্থার রূপ। ঝাকড়া মেহেদী গাছ। গোল উঠোনের ওপাশে ছিল পলেস্তরা উঠে যাওয়া ভাঙাচুরা একটা রান্নাঘর। ছাতলা পরা দেয়াল ঘেঁসা ওই বাড়িটাতে একটি যেনবা শত ডাল বিস্তারিত ঝাঁক ঝাঁক পাতায় ভরা আতাফল গাছটিই ছিল নওশীনের মুক্তির একমাত্র উন্মুক্ত পৃথিবী। কী বিমর্ষতায়, কী কষ্টে বেদনায়... কী যাতনার দুঃসহ পীড়নে দমবন্ধ লাগলে সে ওই গাছটিতে আশ্রয় নিত। চারপাশের বাতাসে দোল খেতে খেতে আসমানের নানারকম রঙ বদল দেখতে দেখতে সে উপলব্ধি করত সুন্দর কী... সুখ কী... মোহ কী। ওই গাছটি তার আশ্রয়ের জায়গা না হলে হয়তো সে বুঝেই উঠতে পারত না সে আসলে আদৌ কোনো দমবন্ধকর পরিস্থিতিতে বাস করছে কি না। পরপর দুবোনের জন্মের পর নওশীনের জন্মে মা এতই পীড়িত হয়েছিল, শুনেছে নওশীন, ক'দিন মা নিজের ক্ষিপ্ততা প্রকাশের ভাষা পর্যন্ত হারিয়ে বসেছিল।

এরপর মা'র গঞ্জনাক্রন্দন আর বাবাকে কেন্দ্র করে তার অসুখী দাম্পত্যের অভিসম্পাতের মাঝে বেড়ে উঠতে থাকা জীবনে বুলবুলির জন্ম ছিল নওশীনের জন্য বিস্ময়কর রকম রোমাঞ্চের। আঁতুরঘর থেকে মা'কে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। ওইটুকুন শিশু... যে কিনা আবার নিথর কোনো পুতুল নয়, তার হাত-পা সঞ্চালন... পিটপিট করে চাহনি... কান্না... সবই অভিনব। ওকে কোলেপিঠে নিজের অস্তিত্বের সাথে মিশিয়ে দিয়েও যেন আশা মিটত না নওশীনের।

বুলবুলির জন্মই নওশীনের ভেতরে ব্যাপক এক কল্পনা আর স্বপ্নের জগৎ তৈরি করে দিয়েছিল। ওইটুকুন শিশু তার দু'আকুল হাত দিয়ে ওর দিকে ঝুঁকে থাকা নওশীনের মুখ যখন ধরত, তখন নওশীন নিজেকে দেখতে পেত বৃক্ষরূপে... হুহু তেপান্তরের মাঝে দাঁড়ানো, যার ডালে আশ্রয় নেয় উড়ে আসা ক্লান্ত পাখিরা। ও যখন হাসতো... নওশীন দেখতে পেতো তার পঠিত রূপকথার রাজকন্যাদের মূর্ত রূপ... যারা নূপুরে নিক্কণ ধ্বনি তুলে প্রাসাদময় উড়ে উড়ে বেড়ায়...।

আরে ভাবি... এই পানি ভেঙে যাইবেন কীভাবে?

গেটের সামনে দাঁড়িয়ে যেন হুঁশ হয় নওশীনের। সামনের বারান্দায় বসে আছে প্রতিবেশিনী। সত্যিই সামনে তো পথ নয় থকথকে নোংরা কাদায় ভরা বিশাল এক এঁদোনালা। ক'দিন ধরেই সোয়ারেজ লাইনের জন্য রাস্তায় ময়নাতদন্ত চলছে। হাঁটুর ওপর প্যান্ট কাপড় গুজে কিছু নারী-পুরুষ রাস্তা পারাপারের মর্মান্তিক চেষ্টা করে যাচ্ছে। দেখেন তো কী কাণ্ড, প্রতিবেশিনীর কণ্ঠে ক্ষোভ, এই কাজগুলো এরা শীতকালে করতে পারে না? বর্ষাকালে মানুষের যত বিপদ বাড়ে ততই এদের ব্যবস্যার ফায়দা। অবস্থা দেখে রীতিমতো বেকুব বনে দাঁড়িয়ে থাকে নওশীন, জিজ্ঞেস করে, রিকশা চলে না?

বিপদকে মহাবিপদ করে দেখানোর সহজাত মজায় প্রতিবেশিনী বলে, আরে আপনি এই কয়দিন ছিলেন কই? লাইন কাটার ফলে জায়গায় জায়গায় যে গর্ত, রিকশা এইখানে মরতে আইব নাকি? তা আপনি যাইবেন কই?

একটা ইস্কুলে জয়েন করেছি, আজকেই পয়লা দিন, বলেন তো কী অবস্থা?

এতদিন পর চাকরি নিছেন? ব্যাপারটা বুঝলাম না।

চাকরি আমি আগে অনেক বছর গলা উঁচু করে নওশীন, মাঝে মুনিয়ার শরীরটা খারাপ করায় চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছিলাম।

রগরগে কণ্ঠ মহিলার, মুনিয়ার এখন কী অবস্থা? স্বাভাবিক হয়ে গেছে?

গেটে এসে দাঁড়ালেই মহিলার এ জাতীয় প্রশ্নে প্রায়ই গা জ্বালা করে। মুনিয়ার প্রসঙ্গে জানতে প্রশ্ন করতে সহানুভূতি প্রকাশ করতে মহিলার যেন চাপা এক উত্তেজক মজা... নওশীন বহুবার দেখেছে তার এই নিষ্ঠুর মুখ... আজ তাচ্ছিল্যে এড়িয়ে উত্তরহীনভাবে সে হু হু পথের দিকে তাকিয়ে প্যার হয়ে মাথায় যাওয়ার উপায় খুঁজতে থাকে।

কিন্তু হঠাৎ ওপর থেকে এক উড়াল হাওয়া আসে। নওশীনের মাথার ওপর কিছু কৃষ্ণচূড়া ফুল ঝুর ঝুর ঝরে পড়ে... ভেতর তরঙ্গে উদ্ভাসিত হয়ে সে ওপর দিকে তাকায়। আরে গাছটির দেহ ভিজে একাকার! ফলে বেঘোর সুখে টেরই পায় নি কাল রাতেও বৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু কয়েকটি সতেজ পাতায় সে মুমূর্ষু চোখে কলি দেখেছিল, তাতে ফুল ফুটেছে? নিচের এই এঁদো পৃথিবীর ওপরে ফকফকা আকাশ। নীল টুনি দুটি কৃষ্ণচূড়ার ডালে এসে কিচমিচ করে খাবার খুঁজছে। ঝড় বৃষ্টির তোপ থেকে বাঁচাতে ইতোমধ্যে সে আর মুনিয়া মিলে বিশাল ড্রামসহ গাছটির ওপর পলিথিন টিনসহ নানা কসরতে একটি নিরাপদ ছায়ার ব্যবস্থা করেছে। বুকের মাঝে সব গুমোট বাতাসে মিলিয়ে যায়। এরপর অন্য একজন মানুষকে অনুসরণ করে কাদাসমুদ্র পেরোনোকে বড় কোনো কষ্টের বিষয় মনেই হয় না।

৭

চড়ইটা আটকা পড়ে ঘূর্ণায়মান ফ্যানের চারপাশে ছটফট করছিল। ফ্যান বন্ধ করে যত তাকে খুলে যাওয়ার পথ দেখাচ্ছিল নওশীন তত ভয়ে কখনো দেয়ালে গোত্তা খেয়ে কখনো বিভিন্ন আসবাবের সাথে বাড়ি খেতে খেতে বেচারার পর্যুদস্ত দশা হয়েছিল, যত দিশাহীন চক্করে ও ঘুর খাচ্ছিল তত অশান্তি লাগছিল নওশীনের। শেষে হাল ছেড়ে ওকে নির্ভয় করতে ফ্যান বন্ধহীন কক্ষে গরমে একাকার হয়ে শুয়েছিল সে।

রিকশায় হুড খুলে বাইরের পৃথিবীতে অনেকদিন পর নেমে কেন যে ওই চড়ুইটির কথা মনে পড়ল নওশীনের জানে না। তবে সে-ও চড়ুইয়ের মতো অস্থির হয়েছিল এ্যাদ্দিন। পার্থক্য এই চড়ুইয়ের অস্থিরতা বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছিল জাস্ট। যত হুজ্জোতই থাকুক চারপাশে যত ভাঙচুর... যত ভিড়, সাত মসজিদ রোডে গিয়ে রিকশাটা পড়তেই এক অদ্ভুত ভালো লাগায় ভেতরটা আচ্ছন্ন হয়ে যায়। সারিবদ্ধ কৃষ্ণচূড়ার ঠান্ডা লালে যেন নৌকা পালের বাতাস লেগেছে। না বাতাস না, এ যেন এক অদ্ভুত চেনা-অচেনা বুনো গন্ধের ঝড়... নওশীন রাবারব্যান্ড খুলে স্থানকাল বয়সের ভেদ ভুলে যায়... উড়তে থাকে চুল।

মোবাইল বাজে... শফিউলের কণ্ঠ, ক্লাসে যাচ্ছ?

ওর প্রশ্নের উদ্বেগ মায়ায় আচ্ছন্ন হয় নওশীন, বলে হ্যাঁ যাচ্ছি, তুমি পরশুই আসছ তো?

হুম... এরপর কিছুক্ষণ চুপ থাকে সে, মুনিয়ার কোনো সমস্যা হবে না তো? ও-তো আজকাল তেমন কিছু প্রকাশও করে না।

আম্মা আছেন না? সেই ভরসাতেই তো আবার চাকরি নিলাম।

তারপরও, চিন্তিত কণ্ঠ শফিউলের, যে 'তুমি' ঘেঁসা মেয়ে আমার।

আহা... 'তুমি ঘেঁসা মেয়ে আমার'। কতকাল পর মুনিয়াকে নিজ অস্তিত্বের সাথে এক করার স্বীকারোক্তি। নইলে অনেকটাই অস্বাভাবিক নিজের ওপর ভারসাম্যহীনভাবে বেড়ে উঠতে থাকা মুনিয়াকে কেন্দ্র করে শফিউলের শংকা, ভয় যে পরিমাণ মেয়েটা থেকে দূরবর্তী করেছিল সেখানে জন্মের পর টুসটুসে দেখতে স্বাস্থ্যবান স্বতঃস্ফূর্ত মৌটুসির আগমন ছিল শফিউলের কাছে আশীর্বাদের মতো। মৌটুসি বলতে রীতিমতো অন্ধ শফিউল... যত অন্ধ সে তত বড় হওয়ার সময়টায় নিজ জগতে দুরন্ত মৌটুসির রীতিমতো নওশীনকে তাচ্ছিল্য করে দূর থেকে দূরবর্তী হওয়া... কেন মুনিয়ার প্রতি এত অপার স্নেহ নওশীনের? বাবার মতো মা কেন তার প্রতি এত মনোযোগী নয়? এ নিয়ে যত মৌটুসির অবুঝ ক্ষোভ, তত ক্রোধ নয়, রাগ নয়, একটা ভয় তাড়িয়ে বেড়ায় নওশীনকে—মেয়েটা না কোন অজানা বিপাকের গহ্বরে পা ফেলে। না... আজ আর কোনো বিপরীত বাতাসকে প্রশ্রয় নয়, ফোন রেখে লম্বা করে তাজা বাতাস থেকে নিঃশ্বাস নিতে থাকে সে।

পয়লা দিনের আলুথালু ক্লাস ঘুরে টিচার্স রুম থেকে সন্তর্পণে বড়পা'র সাথে লাইব্রেরি রুমে এসে বসে নওশীন। বড়'পা এই স্কুলের সিনিয়ার টিচার। নওশীনদের সেই বদ্ধভূমিময় সংসারে একদিকে সেলাই ফোঁড়াই একদিকে টিউশনি করে পড়াশোনা চালিয়েছে সে। নওশীনের বিয়ের বেশকিছু পরে তার বিয়ে হওয়ার পরও হাজার যুদ্ধ করেও সে সংসারটা টেকাতে পারে নি। বড় ছেলে বাবার সাথে চলে গেছে, ছোট মেয়েটাকে ভেতরে প্রাণপণ আঁকড়ে ধরতে চাইলেও বাইরে কঠোর অনুশাসনে যত তাকে জীবনের বিন্যস্ততা শেখায়, তত সেই মেয়ে তা ভাঙতে পছন্দ করে।

প্রায়ই কথা হয় ফোনে। একই শহরে আজ বহুদিন পর দেখা... একথা সে কথার পর ফিসফিস করে তার অবস্থা জানতে চায় নওশীন...

বড়পা'র মুখের কাঠিন্যের মধ্যেও ভিজে উঠতে থাকা চোখ দৃষ্টি এড়ায় না, ওদের বাবা দ্বিতীয় বিয়ে করার পরেও দেখ ছেলেটা সৎমা'র কাছে থাকব, আমার কাছে না, ওখানে ওর পড়াশোনা দেখার কেউ নেই। নিজের মতো যেখানে খুশি দিনরাত কাটাতে পারে, কেউ কিছু বলার

নেই, মেয়েটা আগে তা-ও একটু সম্মান ভয় করত, এখন বলে, সব দোষ নাকি আমার।

লাইব্রেরিতে প্রায়ান্ধকার ছায়া। এক দুঃস্বপ্নের নেশা যেনবা এই সময়কে পরিবেশকে এখনকার মানুষকে অশরীরীর মতো গ্রাস করছে।

তুমি একটু বন্ধুর মতো ব্যবহার করো না কেন ওদের সাথে ? দেখো নওশীন... প্রত্যেকটা সম্পর্কের আলাদা একটা মর্যাদা আছে জায়গা আছে। আমাদের মা-বাবার মধ্যে কত ঝামেলা আছিল, আমরা তাদের অসম্মান করছি ? ভয় পাই নাই ? বাবা-মা বন্ধু হয়া গেলে ওরা বুঝব বাবা মা'র সাথে কী করতে হয়, বন্ধুর সাথে কী ?

তারপর সময়ের বদলটা দেখবে না বড়পা। আমাদের এই এক দোষ নিজেদের সময়ের আচরণ ওদের মধ্যে দেখতে চাই, তুমি বাবা মা'র কথা বললে, কিন্তু মা'কে গ্রাম থেকে বিয়ে করে আনা চাকরিজীবী আউলা-ঝাউলা বাবা-মা'র জীবনের সময়ের সাথে আমাদের সময়ের মিল ছিল ? তারা তাদের চিন্তাভাবনা আমাদের ওপর চাপিয়ে দেন নি ? তুমি মেনেছিলে তখন মা'র কথা ?

মা তো আমাদের বাল্যবিবাহ দিতে চেয়েছিল, এটা যে-কোনো সময়ের মানুষের জন্যই প্রতিবাদের। আমি তো তার বোঝা হই নি নিজের ইনকাম নিজে করে পড়াশোনা চালিয়েছি, সংসারের দায়িত্বও কি নেই নি ? আমার ছেলেমেয়েরা এসব বুঝে ?

তুমি বুঝাও... বাবা-মা'র সাথে বন্ধুত্বের রকমটা কেমন ? তারা নিশ্চয়ই তোমার সাথে সমবয়সী বন্ধুর আচরণ করব।

এত বুঝ আছে ওদের ? যত সহজে যে-টা মিলে, যে-টা যত সহজে করলে ভালো সেই পথেই ওরা দৌড়ায়... সততা-অসততা এইসব শব্দ ওদের কাছে কঠিন লাগে, কঠিনেরেই যত ঘিন্না ওদের... এরপর নওশীনের এত দৃঢ়চেতা বোন আলুথালু ভেঙে পড়ে ফাঁকা লাইব্রেরির চারপাশে তাকায়, তিতলি আমার কাছে আর থাকবে নারে... ও যে কী করে... কী লুকায়... কিচ্ছু বুঝি না... সময় বদলেছে বুঝি ? কতটা বদলেছে এই কয়টা বছরে ? একেবারে আসমান জমিন ?

ভেতরটা ফাঁকা ফাঁকা লাগে নওশীনের। চারপাশের গুমোট আলোছায়া নয়... অলৌকিক মরিচার উড়াউড়ি... বইয়ের গন্ধে যতটা না নেশা লাগে তার চাইতে জ্বৎপিণ্ডে রক্তপাতের স্তব্ধতা... এই বইয়ের সাথে নওশীনের দুর্মর প্রেম... অপার্থিব টানের মাঝে হাহাকার ওঠে বুকে, আহা! শেষ পর্যন্ত সাহিত্য আমাকে ছেড়ে গেল ?

আমাকে ছেড়েছে ? না, আমি সাহিত্যকে ?

নিজের এই বেদনার পাক থেকে বেরোতে একেবারে বোদ্যাইয়ের মতো বেখাপ্পা প্রশ্ন করে, তুমি আরেকবার বিয়ে করো বড়পা... আমি আগেও তোমাকে বলেছি... মানে জীবনটা একাকী... বলে নিজের মধ্যে কুঁকড়ে যেতে গিয়েও বড়পা'র মুখের হাসির উদ্ভাসন দেখে অবাক হয় নওশীন।

তুই যে আমাকে এখনো বিয়ের বয়সী ভাবতে পারতেছিস, এইটাই কম কী। বুড়া বয়সেও ঝুইল্যা পড়া শরীল নিয়ে ব্যাটাগুলা খালি বাচ্চা পয়দা করার ক্ষমতা রাখে বলে এই দেশে পুরুষদের বয়স হয় না। কুত্তা-বিলাইয়ে দেশ ভরতছে খালি... ওরা কী করে কী খায়... খবর রাখে কেউ ? বলতে বলতে সচকিত হয় বড়পা... নিজেকে সামলে ফের ফিসফিস করে, বুঝলি এক স্বামীর এক খোটা দুই স্বামীর দশ খোটা... দুইবার বিয়ের পর দ্বিতীয় স্বামী তো বউয়ের যে-কোনো পর্যুদস্ত দশায় রীতিমতো খোটা দেওয়ার ট্রামকার্ড পেয়ে যাবে, কারণে অকারণে এক গঞ্জনা, খোটা দেবে, এই জন্যেই আগের সংসার করতে পারছ নাই... এর লাইগ্যাই তোর স্বামী তোরে ছাইড়া গেছে। এছাড়া একা কই, বাবা আছে না আমার সাথে ? যেনবা ভূমণ্ডল ফুঁড়ে ওঠে নওশীন, আমার জীবিত একজন বাবা বড়পা'র বাসায় থাকে এটা কেন ঘুণাক্ষরেও মনে থাকে না আমার ? মনে হয় মা'র সাথে বাবাও কবরে শায়িত... রীতিমতো তোতলায় কেমন আছে আব্বা ?

এই তো কখনো সুস্থ কখনো সুস্থ কেটে যাচ্ছে। বাদ দে, রোশনারার কোনো খবর জানিস ?

না, অনেকদিন কথা হয় না।

কী জানি ওর সাথে কথা বললে আমারও জুত হয় না। স্বামী নিয়ে দুবাইয়ের ডাটফাটের গল্প শুধু, নিজে কেমন আছে সুখে না দুঃখে, ওইসব কথার ধারে কাছেও যায় না, তোর পিঠাপিঠি, খাতিরও ছিল তোর সাথে বেশি, একটু খোঁজ নিলেই পারিস তুই। জানি কেমন হয়ে গেছিস নওশীন আর তোকেই কী বলব, আমাদের পরিবারের জন্য তুই যে বলির শিকার হলি...।

ঘন্টা বাজে।

টিফিন টাইম শেষ হয়েছে।

বিকেলে স্কুল থেকে বেরুলে অনুভব করে নওশীন, এ্যাদ্দিন ঘরবাড়ি থেকে বেরুনোর পর এক্ষুনি আজ আর ফিরতে ইচ্ছে করছে না। সে মৌটুসির মোবাইলে ফোন দেয়, তুমি এখন কোথায় ?

ক্লাস শেষ, আমার এক ফ্রেন্ডের আজ বার্থ ডে, আমরা একটু পিজাহাটে বসব। কেন ?

মেয়েটার কণ্ঠে আমুদে মুড... বেশির ভাগই ওর মেজাজ চড়ে থাকে নিজের অপারগতার জন্য। যতদিন যাচ্ছে পাঠ্যপুস্তকের তলায় চাপা পড়ছে স্টুডেন্টদের অস্তিত্ব... মায়া লাগে দেখতে নিজের চাইতেও ভারী একটি ব্যাগ কাঁধে নিয়ে নুজ শিশুদের, যখন যেনবা ক্লান্ত বৃদ্ধ... এমন দৃশ্য দেখতে। সেখানে পড়াশোনার গাদা গাদা ভারই মৌটুসির কাছে মারাত্মক, এটাই করতে গিয়ে তার এসপার ওসপার দশা। এর বাইরে কিছু করতে বললে এমন মেজাজ চড়ে ওর, নওশীন রীতিমতো ওকে ভয় পায়। তাই খুব সন্তর্পণে ওর মেজাজ মর্জির ধরন বুঝে যে-কোনো বিষয় নিয়ে সবসময় নওশীন এগোয়, না, মানে আজ আমি ক্লাস শেষে একটু বাইরে কাজ সেরে ফিরব। মিনাবাজার থেকে বাজার করাও আছে, মুনিয়াকে নিয়ে একটু চিন্তা হচ্ছে।

কেন, দাদু তো বাসায় আছে।

না, মানে তোমার দাদু তো ওর সব ব্যাপার বোঝেন না, তার সাথে অত খাতিরও হয় না মুনিয়ার, তুমি বুঝো-ই তো।

তেতে ওঠে মৌটুসী, আমার সাথে যেন কত খাতির আছে। ভেতরটা হালকা একটু কেঁপে উঠলেও সহজাত স্বভাবে সামলে নেয় নওশীন, খাতির আছে, তোমাকে পছন্দ করে, তুমিও করো, কিন্তু তুমি তা স্বীকার করবে না জানি।

ঠিক আছে। ঠিক আছে। এই একই প্যাচাল বারবার পারার দরকার নেই।

এইবার ক্ষোভ ঝরে পড়ে, প্যাচাল শব্দটা উইথড্র করো মৌটুসি... আমি পারতপক্ষে তোমার ওপর কিন্তু কিছু চাপাই না। ও'কে, তুমি যখন খুশি ফিরো আমি বাসায় যাচ্ছি।

ফোন রাখার পর টের পায় নওশীন, রাগে শরীর কান সব ঝাঁ ঝাঁ করছে। কেন যে এসব সহ্য হওয়া হয় না... অভ্যস্ত হওয়া হয় না... সামনের পুরো পরিবেশটার মধ্যে আচমকা মরচে পড়া ধোয়াশা... এর মধ্যে উষ্ণতাপকে শীতল করে মৌটুসির ফোন... সরি আম্মু, আমি জাস্ট পিজাহাটটা হয়েই বাসায় চলে যাব।

হলিক্রসের সামনের আমার ভার্সিটির সামনের অবস্থা জানো, ঠেলাগাড়ি, রিকশার মার্কেট... রাস্তায় খুব জ্যাম, আমাদের ওদিকেই থাকে আমার এক ফ্রেন্ড, ও আমাকে ড্রপ করবে। থ্যাংক ইয়্যু মা।

ও.কে আমি রাখছি, তুমি তোমার কাজ সেরে আসো।

গিজগিজে যন্ত্র মানুষে ভর্তি এই শব্দময় রাজধানীতে সন্ধ্যা আসন পেতেছে। শায়েদকে ফোন করে কখনো ঠায় দাঁড়িয়ে কখনো ছুটে ছুটে গিয়ে একের পর এক কখনো কখনো সিএনজি কখনো ট্যাক্সি থামানোর চেষ্টা করে নওশীন। কী ভরা কী খালি কোনো বাহনই থামে না। এক পর্যায়ে অসহায় জমে থাকা উদ্যমে সে মানুষ গাড়ি ভিড় ঠেলে ঠেলে কখনো তেছরা কখনো বাঁকাচোরা হয়ে হাঁটতে শুরু করে। ওয়ানওয়ে রোড। রিকশা চলে না। একসময় ফুটপাতে হকারদের বসানো পসরার ওপর দিয়ে শাড়ির কুচি ধরে ধরে কখনো জোর কদমে কখনো বকের মতো লাফ দিয়ে দিয়ে ধানমণ্ডির গলির মধ্যে ঢোকে। মাঝে দু'বার শায়েদ ফোন করেছে। এরপর রিকশায় উঠে কিছুটা হাঁপ ছাড়ে। কেঁপে কেঁপে উঠছে শরীর। ধানমণ্ডির লেকের চারপাশটা বর্ণাঢ্য হয়ে উঠেছে। এ শহরে মানুষের একটু শ্বাস নিয়ে কোথাও বসার জায়গা নেই। ধানমণ্ডির নীরব শান্ত লেক তার স্নিগ্ধ মায়ার লাবণ্য হারালেও ভালো লাগে নওশীনের। দিনরাত খাদ্যবস্ত্রের পেছনে যন্ত্রের মতো লেগে থাকা মানুষদের প্রাণটাকে পারে নি প্রযুক্তি নিজের সত্তায় নিতে। একফালি বাতাস নিতে একটু বেঁড়ানোর স্বপ্নে মানুষ ফাস্টফুডের দোকান শপিং সেন্টার বাদ দিয়েও প্রকৃতির কাছে এসে দাঁড়াতে পছন্দ করে।

চারপাশে তরঙ্গিত জল... এবং ওপরে বোট নিয়ে ভ্রমণরত মানুষেরা... এর ওপর আকাশের ওপরে আকাশ বাতাসের ওপারে...

নওশীন...।

ভিড়ের গুঞ্জন ফুঁড়ে এই ডাক নওশীনকে উদ্ভাসিত করে। সে দেখে ভাসমান রেস্টুরেন্টে একটি টেবিল আগলে দাঁড়িয়ে আছে শায়েদ। হুহু বাতাসের মধ্যে সেতুটা পার হতে গিয়ে অদ্ভুত এক ভালো লাগায় আচ্ছন্ন হয় নওশীন।

মাই গড! তোমার তাহলে আজ সময় হলো বাইরে আসার ? হাসে শায়েদ, আমি তো বলতে বলতে হাল ছেড়ে দিয়েছিলাম।

এ্যাই আজ কিন্তু আমি ফোন করেছি।

ধন্য করেছেন ম্যাডাম... বলতে বলতে চেয়ার টানে শায়েদ। দু'জন মুখোমুখি বসে, কতদিন পর এমন কোথাও আমরা বসলাম গুনতে পারো ? শায়েদ বলে, দিন বলছি কি, কত মাস ? কত বছর ?

এই শহরে বাইরে বসার মতো অবস্থা আছে ?

তাহলে এরা কারা এই যে ভিড় করে বাইরে বসার জন্য এসেছে ?

শায়েদের প্রশ্নের উত্তরে হালকা তরঙ্গে হাসে নওশীন, আরে একটা সময় আমরা চলতাম বসতাম.. তখন আমাদের পরিবেশ আমাদের মতো ছিল। এখন ওরা চলছে বসছে, এটা ওদের পরিবেশ... জায়গা খালি করতে হবে না ? আমরা গেড়ে বসে থাকলে এই প্রজন্ম কোথায় এসে বসবে ?

তাহলে কেন বসার পরিবেশকে দোষ দিচ্ছ ?

আরে সময় বদলাবে, মানুষ বদলাবে আর আমরা আমাদের পেরিয়ে আসা যাপিত জীবনকে শ্রেষ্ঠ ভেবে চুপ থাকব ? সব বুঝতে পারছি, এ জন্য ? আফসোস অভিযোগ করা বন্ধ করে দেব।

কে বলবে তোমার সাথে গতকালই আমার দেখা হয় নি ? হা হা হাসে শায়েদ। তো কিছু অর্ডার করি ?

অর্ডার শেষে নওশীন ধাতস্ত হয়ে তাকায় শায়েদের দিকে, অসুখের ভালোই ধকল গেছে তোমার ওপর দিয়ে, মুখটা শুকনো শুকনো হয়ে গেছে, সরি, আমি যাই যাই করে তোমাকে দেখতে যেতে পারি নি।

তুমি ডাক্তার ? এলে সুস্থ হয়ে যেতাম ? ফের হাসে শায়েদ, তোমাকে আমি চিনি না ? নিজের অসুখে বাড়ির বাইরের মানুষকে টিকিটি পর্যন্ত জানতে দাও না, তুমি আসবে আমার জ্বর দেখতে, ভদ্রতা করো না, তোমাকে এটা মানায় না, ও হ্যাঁ, মাত্র মনে পড়ল আমার অসুখের সময় তুমি ফোন করেছিলে, বকুলি বলেছিল, এক্ষণ মনে পড়ল। শায়েদ স্যাভুউইচে কামড় দেয়, কী যে অবস্থার মধ্যে আছি কী বলব জরুরি কিছু ?

স্মরণ করার চেষ্টা করে নওশীন, ও হ্যাঁ, তেমন কিছু না। আসলে মুনিয়া কী মনে করে ওদিন বারবার তোমার কথা বলছিল, কেমন যেন স্বপ্নঘোরের মাঝে পড়েছিল সে সেদিন, আমার এত অবাক লাগছিল...

মুনিয়া ? আমাকে ? রীতিমতো হেঁচকি খায় শায়েদ। এর মাঝেই শফিউলের ফোন, কী ? বাজার করছ ?

নওশীন মুহূর্তখানেক বিব্রত বোধ করে বলে, আসলে শায়েদের কদিন যাবৎ ভীষন জ্বর জানোই তো, ভাবলাম ওকে একটু দেখে তারপর বাজার করে যাই। মৌটুসির্কে ফোন করেছিলে ?

হ্যাঁ। মুনিয়ার সাথেও কথা হয়েছে, শফিউলের গলায় উচ্ছ্বাস, কী বলেছে জানো, আব্বু তুমি জলদি চলে আসো, আমার খালি খালি লাগছে। কতদিন পর এমন কথা আমাকে বলল, আমার কী ইচ্ছে করছে জানো, অফিসের কাজ ফেলে এক্ষনি ঢাকায় চলে আসি।

তা-ই ? উচ্ছ্বাসে ভেসে যায় নওশীনও স্থির, আসলে ওর মধ্যে অনেক বদল আসছে, সেই ভরসাতেই তো স্কুলে জয়েন করলাম।

বাইরে বেশি দেরি করো না, শফিউলের এক চিরকালীন সাবধান বাণী, জানোই তো রাত হলে...।

জানি। জানি।

৮

কিছুক্ষণ মাঝখানে এক স্তব্ধ স্থবিরতা তৈরি হয়, দেবদারু পাতার সতেজতায় মৃদু কাঁপন লেগেছে... যেন পুরুষ স্পর্শে কোনো কুমারীর কাঁপন... লেকের ঠান্ডা জল যেন মাঝরাতের বাঁশির মিহি সুর, এমন অদৃশ্যে পাক খেয়ে খেয়ে ছুইছে পাতাকে... সুক্ষ্ম চোখে কেবল নওশীনই দেখতে পারছে অনুভব করছে এক স্ফুলিঙ্গের সুন্দরতাকে। আমার অসুখের সময় কী বলছিল মুনিয়া ? হাওয়া ঘোরায় শায়েদ।

এমন কিছু না। আসলে এটা ওই সময়ের এমনই একটা অনুভূতিক মুহূর্ত, মানে ওর জন্মের পর বেড়ে উঠা সময়টায় ও যখন দাঁড়ানোর বয়সে দাঁড়াত না... কথার বয়স পেরুলেও তোতলাত ... আমরা একেবারে ভেঙে পড়লাম। তুমিই অনেকটা সময় তার সাথে কাটিয়ে তাকে স্বাভাবিক বোধ দিতে, তোমার জীবনে ব্যস্ততা এলে ওকে আমি সামাল দিতেই পারতাম না। কারণে অকারণে কাছে পেতে তোমার জন্য কাঁদত। এখন অনেকটা সয়ে গেলেও তোমাকে দেখতে ও পাগল হয়। আমি চাইছিলাম তোমার সাথে কথা বলিয়ে দেই। তাতে ও যা চাইছিল তা হতো না হয়তো, তবে ফোনে শব্দ দিয়ে কিছু বোঝানোর চেষ্টা করতাম হয়তো। তো বলো তোমার দিন কেমন যাচ্ছে ?

কাটা চামচে ডিম চপ-এর পেট ফুটো করে, আনন্দ, নবনীতা তোমার সংসার, সব ঠিক ? কীসব কেজো কথা বলছ... গাছপালা, জল ধেয়ে আসা বাতাসে বড় বিমর্ষ দেখায় শায়েদকে, আসলে নওশীন, তোমার আমার পরিচয়টা কতদিনের বলো ? কী দিন ছিল আমাদের, না ?

আমরা আমাদের যে স্মৃতির সাথে পরিচিত, যে অভিজ্ঞতা পেরিয়েছি আমরা, আমরা আমাদের ভেতরটার সত্যগুলোকে যেভাবে সময়ের ধাপে ধাপে দেখেছি, সম্ভব, নতুন কারও কাছে মুখে রক্ত তুলেও তা বোঝানো ?

নিঃশ্বাস টেনে সিগ্রেট ধরায় শায়েদ, সত্যিই নওশীন তোমার মনে হয় যে বদলানো পরিবেশে নতুনদের জায়গা দেওয়ার জন্য আমাদের জায়গা ছাড়তে হবে ? তাহলে আমরা বসবটা কোথায় ? আমি তুমি জীবনের যা যা দায়িত্ব যদ্দুর সম্ভব করেছি, করে যাচ্ছি, তুমি আর দশটা মেয়ের মতো কখনো স্বামীর জীবনযুদ্ধের সাথে চলে অবস্থা বুঝে বুঝে পরিপাটি সংসারের স্ত্রী হয়েছো। দুরকম দুটো মেয়ের মা হয়েছ। কিন্তু তুমি কি আর দশটা মেয়ের মতো আর এগুতে পারছ ? কৈশোর পেরুনো যৌবনের একটা প্রান্তে এসে তুমি কি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে যাও নি ? একবার ভাব তো। মেয়েকে বিয়ে দিয়ে নাতনির মুখ দেখে তুমি কতটা পারবে নানিমা হতে ? নিজেকে জিজ্ঞেস করে দেখেছ, তুমি একটা জায়গা ছাড়তে হলে আরেকটা যে জায়গা ধরতে হয়, তার কতটা ধরতে পারছ তুমি ? সেই জায়গাটার কতটুকু তুমি দেখতে পাও ?

এসব কথা তো নয়, যেন সমাহিত নিবিড়তায় বল্লমের ঘা। ভালো লাগে এই ঘা খেতে, মনে হয় কেউ তো পারল জায়গাটা ধরতে, যে জায়গা অদৃশ্য সমাহিত, সে নিজেও খুঁজে পায় না কেবল সেখান থেকে উত্থিত নিকষ কালো ডিপ্রেশনের চক্করে খেই হারায় কেউ তো ঘা দিয়ে জায়গাটা শনাক্ত করতে পারল, নওশীন বলে, জাগতিক লড়াইগুলো যখন করতে করতে পর্যুদস্ত থাকতাম মানে এখনো যখন থাকি, এখন এর মোকাবেলা করতে করতেই এমন অবস্থা যায়, যখন যা নিয়ে সংকটটা তৈরি হয়, এর সূত্র খোঁজার অবস্থা থাকে না। জানো শায়েদ, আমি আসলে বেশ কিছুদিন ধরে অদ্ভুত এক নিস্তরঙ্গ জীবনযাপন করছি। তুমি নিশ্চয়ই টের পেয়েছ। এ নিয়েও ভেতরে ভেতরে কম মাথা কুটি নি। কেন নিস্তরঙ্গ, কেন কোনো রোমাঞ্চ নেই, স্পন্দন নেই... এসব যত আমাকে হতাশ করছিল, যত মনে হচ্ছিল, তবে কী ফুরিয়ে যাচ্ছি, তখন কেমন যেন ধীরে ধীরে ভাবনার একটা চোখ খুলতে শুরু

করছিল। দেখো, আমরা যখন রাজ্জাক, কবরী, উত্তম, সুচিত্রার ছবিগুলো দেখতাম, আমরা কিন্তু তাদের জেনারেশনের ছিলাম না, তারপরও তখন পরের জেনারেশনের মানুষ হয়েও দেখতাম, শুনতাম, সেই রাজকাপুর-মীনা কুমারীদের আমলেও নিজের পছন্দে প্রেম করে কেউ বিয়ে করলে তাদের গার্জেনরা বলেছেন, আর বলবেন না, আজকালকার ছেলেমেয়ে, ওরা কি আমাদের পছন্দে কিছু করবে ? নিজে পছন্দ করে আমাদের যে বিয়ের কথা জানিয়েছে এটাই বেশি। প্রেম করে বিয়ে করলে শত বছর আগের গার্জেনরা সন্তানদের নিয়ে যা বলতেন, এখনকার গার্জেনরাও তা-ই বলেন, যদিও পরিপার্শ্ব অনেক বদলেছে, এখনো বদলাতো, এখন হয়তো একটু দৌড়ে বদলাচ্ছে বলে একা হিমশিম অবস্থা তৈরি হচ্ছে। স্কুল-কলেজ-ভার্সিটিতে ইংরেজির আগ্রাসনটা কখনো এত তুমুল ছিল না, তারপরও, এই যে আজকালকার ছেলেমেয়েদের নিয়ে ইংলিশ বাংলা মিডিয়ামের মিশেলে গার্জেনদের 'গেল গেল' ভয়—বুঝতে পারছ শায়েদ আমি কী বলতে চাইছি ? এই ভয়টা গার্জেনদের নানা রূপে আকারে হলেও 'চিরকালীন' মানে কোনো প্রজন্মই তার পরের প্রজন্মের স্বাধীনতা বোধটাকে বুঝতে পারে নি, পজেটিভিলি গ্রহণ করে নি...।

ওয়েটার এসে দাঁড়ায়, বিনে পয়সায় এত গুরুত্বপূর্ণ চেয়ার দখল করে শায়েদ নওশীনরা গেজিয়ে যাবে, তা মেনে নেওয়ার অবস্থা তার কই ? অন্য কাস্টমার এসে ভিড় করছে। শায়েদ বলে, তুমি স্যান্ডউইচ অর্ডার করেছ আমি লাচ্ছি অর্ডার করি, ঠান্ডায় আরাম হবে, বার্গার দেব ?

মজা করে হাসে নওশীন, এই জেনারেশনের তুমুল পছন্দের খাবার ? যা নিয়ে আমরা তাদের খোটা দিই ? রাগ করি ?

ফাজলামো করো না। আমরা বাইরে কোথাও এমন কোনো জায়গায় এসে বসেছি মানে ভেতরে এখনো সেই মনটাকে মরতে দেই নি, এই বা কম কী ?

কী জানি শায়েদ বলে, আজকেই এখানে এসে শেষ বসা কি না, কী বলি, যতই চেষ্টা করি, চারপাশের টাটকা তরুণদের মুখরতায় অস্বস্তি কি হচ্ছে না ? প্রত্যেকটা সময়েরই একেক রকম অবস্থান, বিবর্তন আকাঙ্ক্ষার ভাষা থাকে। আমরা এই প্রজন্মের চলমানতাকে অগ্রাহ্য করছি না ঠিক, তাই বলে নিজেকে ঠেসে ঠুসে সেখানে বসিয়ে এর প্রমাণ দিতে হবে ? এ জন্যই বললাম... মনে হচ্ছে আজ শেষবারের মতো এখানে বসে এই জায়গাটা দেখছি।

এইভাবে বলো না। কোনোকিছুর শেষ শুনতে ভালোগে না, ভয় হয়।

কিন্তু তুমি নিজের অজান্তেই ভেতরে ভেতরে সেই আলস্যকে স্থবিরতাকে প্রশ্রয় দিচ্ছ টের পাও ? অথচ যে-কোনো পর্যায়ে তুমি ভেতরে যতই নির্জনতাকে তোয়াজ করছ, আশ্রয় করছ ততই তোমার বাইরের হুজ্জতে ধাক্কিয়ে-গুতিয়ে মুখর করতে মজা পাচ্ছ। আজকাল তোমার, ঠিক আজকাল না, বেশ অনেকদিন ধরে তুমি ভেতরে বাইরে এত ঝিম মেরে গেছ যে তোমাকে মাঝে মাঝেই আমার অচেনা লাগছে, কী, হয়েছে কী তোমার ? ওয়েটার অর্ডার নিয়ে চলে যায়।

সন্ধ্যার পরও ক'টি চড়ুই কিচমিচ করে অচেনা পাতার ঝোপে। হায়! নওশীন জানত, পাখিরা আলো আর আঁধার চেনে, পাখিদের কী সুখ। এই নাগরিক আলোতে পাখিরাও বিভ্রান্ত... ওদের মধ্যেও কি ইনসমনিয়া হতে শুরু করেছে ? কী জানি ?

কী হয়েছে ? ধাক্কা খায় নওশীন, বলেও সেটা, এরকম প্রশ্ন তুমি অন্তত করো না, আমার হঠাৎ কিছু হয় নি, হ্যাঁ হয়তো চারপাশের বদলে, মানুষের জীবনের শ্বাসরুদ্ধকর ব্যস্ততার মাঝে একফোঁটা বাতাস নিতে যাওয়ার উদ্যমটা অনেক নষ্ট হয়েছে, তাতে ভেতরের দাপাদাপি বেড়েছে শতগুণ, এ নিয়ে কিছু বলতে ইচ্ছে করছে না এখন, আর ভেতরে সেই দাপাদাপিতে যতই স্থবিরতাকে প্রায়ই প্রশ্রয় দেওয়া হয়ে যায় হয়তো, কিন্তু এটাই শেষ, এ আর করব না, এ আর হবে না, এ ভেবে এক মুহূর্তও বাঁচতে পারি না। যা হওয়ার প্রাকৃতিকভাবেই হতে থাকুক না, এই শেষ, আর হয়তো হবে না, আসব না এসব এই ভেবে প্রত্যাশাকে নষ্ট করার তো কোনো অর্থ হয় না।

তুমি তা হলে এসব কী প্রসঙ্গ নিয়ে পড়লে ? হাঁপ ছাড়তে চায় শায়েদ, একটু খোলা পরিবেশে এসেছি, চাইছি মন খুলে উদ্দাম কথা বলি, না, তুমি—

ভেতরটা দমে যায় নওশীনের।

কেন সে এইসব কথা শব্দাকারে কারও কাছে প্রকাশ করতে যায় ? বাক্য আর শব্দের কতটা সামর্থ্য কতটা যোগ্যতা থাকতে পারে ভেতরের ব্যাপক অনুভবের ক্ষরণ অস্থিরতা যুক্তিতর্কের বিভ্রমকে ধারণ করার ? ব্যাপক বাদ থাক... ভেতরের ক্লান্ত অন্ধকার নৈঃসঙ্গে একফোঁটার ঝটকায় যে এক আসমান বিপর্যয় ঘটে, সেই এক ফোঁটাকে কোনো শব্দ কী কী শব্দ ছুঁতে পারে ? কানের মাঝে কিছু ধ্বনি শুধু... যে ধ্বনি যার কাছে প্রকাশ করা হচ্ছে কী আকুল ভাবেই না মনে হয়, যে শুনছে সে ভেতরের বিলোড়নটাকে তারই মতো দেখতে পারছে, অনুভব করতে পারছে ? অন্তত শায়েদ ? যা-কে জীবনের নানা পর্যায়ে সে নানাভাবে অনুভবের চেষ্টা করেছে, সে-ও কি এখন ক্লান্ত ? এইসব শব্দগুলোকে ভারী মনে হওয়ায় আর সবার মতো সে-ও হালকা শব্দ শুনতে চাইছে ? অন্তত কপোপকথনের এমন পর্যায়ে ?

এই শতাব্দীর তাজা খবর... ওসামা বিন লাদেনকে কাল হত্যা করেছে মার্কিন বাহিনী... মুহূর্তে সুর পাল্টায় নওশীন... একজন মানুষকে খুঁজে পেতে দশ বছর ধরে আকাশ পাতাল এক করেছে যুক্তরাষ্ট্র... প্রেসিডেন্ট ওবামার আনন্দটা দেখেছ ? ওসামার ভূতকেও ওদের ভয়, তাই হত্যা করেই তড়িঘড়ি করে ওকে সাগরে ভাসিয়ে দিল। লাচ্ছিতে চুমুক দেয় শায়েদ, শতাব্দীর খবর যদি বলো, তবে এ শতাব্দীর দ্বিতীয় বছরে পা রেখেই টুইন টাওয়ার ধ্বংসের ব্যাপারটা এ প্রসঙ্গের সূত্র ধরে আগে প্রাধান্য পায়।

ওসামা সন্ত্রাসী হলে বুশ তো তার চাইতে শতগুণ পাপী... আর যুক্তরাষ্ট্র যদি বিশ্বে এত শান্তি চায় তো নিজের দেশকে ফতুর করে হলেও আফগানিস্তান, ফিলিস্তিন, ইরাকে বছরের পর বছর ধরে নিরপরাধ মানুষের ওপর হত্যাযজ্ঞ কী করে চালিয়ে যাচ্ছে ? এইবার শায়েদের মধ্যে বিমর্ষতা নামে। প্রাণচাঞ্চল্যে ভরা নওশীনের উপস্থিতি শায়েদের মধ্যে অদ্ভুত এক প্রাণশক্তি দেয় সবসময়। জীবনের নানা পর্যায়ে বিশেষত যখন শায়েদের দাম্পত্য হাঁপ ধরেছে, নিঃশ্বাস ফেলতে পেরেছে ওর সামনেই। আজও দূর থেকে ধেয়ে আসতে থাকা ধনেপাতা শাড়ি হলুদ নকশা কাজ করা নওশীনকে দেখে অদ্ভুত এক প্রশান্তিতে আচ্ছন্ন হয়েছিল সে। দুজনের সম্পর্কের বিবর্তনের মধ্য দিয়েই ভালো লাগারও বিবর্তন ঘটেছে... আচমকা প্রসঙ্গ পাল্টে বিশ্ব রাজনীতির মধ্যে পড়ে যাওয়া নওশীনকে বড্ড খাপছাড়া ঠেকছে। নিজের ওপরই রাগ লাগছে, মনে হচ্ছে স্রোতের মতো একটা প্রসঙ্গ নিয়ে বইতে থাকা নওশীনকে হালকা শব্দের ভার দিয়ে যেন আচমকা বাঁধ দিয়ে ফেলেছে সে। এখন কোন সূত্র ধরে এগোলে আবার অনাবিল জায়গাটা পাওয়া যাবে তা খুঁজতে গিয়ে বেখাপ্পা সাথে সাথে বিরক্তও লাগছে।

ইসাবেলার এক্সিডেন্টের কথাটা বলবে ?

না, এতদিন পর নওশীনের সাথে দেখা। এখন দুম করে এই প্রসঙ্গ তুললে সব বাদ দিয়ে নওশীন ইসাবেলার প্রতি মানবিক হয়ে ব্যাপারটাকে ব্যাপক করে

তুলবে।

তোমার কী মনে হচ্ছে শায়েদ একজন লাদেনকে হত্যা করে পৃথিবী থেকে সন্ত্রাস নির্মূল হয়ে গেছে এটা ভেবে আনন্দে ভাসা কোনো যুক্তিযুক্ত ব্যাপার ?

মাথা তোলে ফের প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে রেখাপাত হয়ে ওঠা নওশীনকে দপ করে নেভায় শায়েদ, এটা কোনো হালকা প্রসঙ্গ ?

চারপাশের হুজ্জোতের মধ্যেও এই টেবিলটার পরিবেশের মধ্যে আচমকা এক নিথরতা জমে। চোখ প্রসারিত করে না ছায়া...না আলো কিছু দেখে না শায়েদ। স্বতঃস্ফূর্ততার রঙিন শিখায় ফুঁ দেয়... না রঙিন নয়, নিস্তেজ শুকনো কাপড়ের ছিন্নভিন্ন রশি... শায়েদ ডুব দিয়ে খোঁজে... নাহ জল নেই। জীবাশ্মের স্তূপে কেবল খরার হাহাকার, মুহূর্তে বোধ হয়, গড়ায়িত আবেগের স্রোতে ধাক্কা খেলে বিশেষত শায়েদের কাছে যেখানে নিজেকে অকপট উপুড় করতে পারে নওশীন... আড্ডায় অসহিষ্ণু চূড়ান্ত দুম করে দাঁড়িয়ে উল্টো হাঁটা দেয়, মোবাইল তর্কের চক্র বিরক্ত হলে দুম করে লাইন কেটে ফোন বন্ধ করে র‍্যাখে। টানা ক'মাস যাবত নিজের জগতে ঘূর্ণায়মান নওশীন কেমন যেন নিভে যাওয়া নিভে যাওয়া মুডে থাকে। কোনো কথা শুরু করে ফের খেই হারিয়ে বলে, কেন বলছি এসব? এসব কি শেয়ার করার বিষয় ? কোনো ঘটনা, যে তার বয়ান করে, সে কি পারে বাক্যের ভেতরের অর্থ রক্তক্ষয় কান্না আনন্দ উপলব্ধির বিবর্তন দেখাতে ? আমরা আসলে হয়তো এমন কোনো কথা শুনতে চাই যার উত্তর ইয়েস অথবা নো-তে শেষ হলেই ভালো। নিম্নমুখী বসে থাকা শায়েদ খেই হারিয়ে বিপন্ন বোধ করে, নওশীন শায়েদকে বলছে এই কথা? তবে কি সে আজকাল শায়েদকে দূরে সরাতে শুরু করেছে ? ভরসা করতে পারছে না, যে শায়েদ তাকে বোঝে ? না, এ মানা যায় না। না, সে তার জীবন থেকে নওশীনের বিলীনতা, দূরবর্তী হওয়া কিছুতেই সইতে পারবে না। ধ্বনির আড়ালে লুকানো প্রতিধ্বনির তলায় ঢুকতে ঢুকতে শোনে শায়েদ নবনীতার কণ্ঠ, আনন্দ'র জন্য রাজ্যির কেনাকাটা করেছে সে, সব সময়ই করে, কেউ প্রবাসে গেলে, তাদের লাগেজে জায়গা হবে কি হবে না, কীরকম বিপাকে পড়ে তারাভ।

তাদের ওপর কাণ্ডজ্ঞানহীনভাবে চাপিয়ে দেওয়া দ্রব্যাদির সামনে তার বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা করে না সে। এটা বুঝেই কয়েকটা টি-শার্ট আর বইতে হালকা হয়, স্পেস কম লাগে এমন কিছু জিনিস নিয়ে গিয়েছিল শায়েদ।

মুখটা আঁধার করেছিল সে ভাইয়ের বাসায়। ভাবি দু'মাসের জন্য দেশে ফিরেছিল অসুস্থ নবনীতাকে দেখতে। শেষ দিন শ্বাশুড়িকে দেখতে এসে, ছেলের জন্য কিনে রাখা শাশুড়ির রাজ্যির আবেগঘন জিনিস ছাড়াও, তার নিজের কেনা বহু আত্মীয়দের নানাজনকে পাঠানো জিনিস নিয়ে এমনিতেই হিমশিম খাচ্ছিল বেচারি... এর মাঝে মহিলাকে দেখে বোঝাই গেছে তার ভাবনার বরাদ্দের বাইরের এক মস্ত বোঝা নিয়ে হাজির হয়েছে ননদ। কিন্তু এসব চোখে দেখে এগুনো, বা এসব বাস্তবতা অন্তত এ ক্ষেত্রে অনুধাবন করা ধাতে নেই নবনীতার। যত বেগে সে তার জিনিসপত্র বুঝিয়ে দিচ্ছিল ভাবিকে তারচেয়ে হাজারগুণ বেগে সে নিকষ কালো মুখ করে হিম ঠান্ডা চোখে তাকাচ্ছিল শায়েদের দিকে। শায়েদের বুকে স্থির কাঁপন... ভেতরে অদ্ভুত ভয়ের এক ঠান্ডা স্রোত ভেতরে যত সঞ্চালিত হচ্ছিল তত তা ঢাকতে সে কেঠো ঠোঁটে হেসে যাচ্ছিল।

এরপর যখন তারা রাস্তায় আলোকজ্জ্বল পথটার মাঝে, নবনীতার পাশে গাড়িতে বসে কী প্রশ্ন করবে এর আগামাথা খুঁজে পাচ্ছিল না শায়েদ, ওর হৃদপিণ্ডকে এ ফোঁড় ও ফোঁড় করে দিয়ে বহুদিন পর বাজ ফেলে নবনীতা, আজ থেকে তুমি আনন্দ'র বাবা হওয়ার নাটকটা বন্ধ করে দাও। তুমি তার সৎ বাবা, এমন সৎ বাবার ছায়া থেকে সরাতে আমি তাকে দূর দেশে পাঠিয়েছি, আজ ওর জীবন থেকে তোমাকে মুক্তি দিলাম। তোমার যেমনভাবে ইচ্ছা করে তেমনভাবে বাঁচো। ঠিকই বলে মানুষ ডিভোর্সি সন্তানসহ কোনো নারীকে বিয়ে করে যত মহান পুরুষই হোক, একসময় সে কতটা পর, কতটা পস্তায়, তার আসল রূপ বেরুবেই। কেন আমি আনন্দকে নিয়ে একা থাকলাম না... তোমাকে বিয়ে করলাম... নবনীতার স্তব্ধ কান্নায় ক্রুদ্ধতায় রীতিমতো বাকহীন হয়ে শায়েদ যেনবা দমহীন এইভাবে কোথায় ডুবছিল... কোন অতলে... কতক্ষণ জানে না শায়েদ। রাতে... অনেক রাতে একাকী শয্যায় অঝোরে কেঁদেছিল সে।

মাই নেম ইজ শিলা শিলা কী জওয়ানি... এই গান এ সময় কোথেকে ভেসে আসছে ?

হকচকিয়ে তাকায় শায়েদ। তাকায় লেকের আশপাশের লোকজনও, ঠোঁটে অবাক করা হাসির রেখা নওশীনের ঠোঁটে, ওর মোবাইলে বাজছে, হালকা শুনতে চাইছিলে না ? শোনো... জবরদস্ত...।

আরে ! কী করছ ? ভূতল থেকে উঠে আশপাশের মানুষের মধ্যে এ গান শুনে চনচনিয়ে উঠতে থাকার উল্লাস দেখে মোবাইলটার দিকে হাত বাড়ায় শায়েদ।

তক্ষুনি মুনিয়ার ফোন... অস্পষ্ট ফোঁপানোর মতো তার ধ্বনি... মা, তুমি আমাকে ছেড়ে চলে গেছ ? আর কোনোদিন আমার কাছে আসবে না ?

মুহূর্তে নওশীনের পৃথিবী এসপার ওসপার হয়ে যায়, সবেগে দাঁড়ায় সে, তোমাকে কে বলেছে এই কথা ? তুমি বিশ্বাস করো আমি এটা করতে পারি ? আমি তোমাকে ছেড়ে চলে যেতে পারি ? তুমি কেন এমন ভাবলে ?

ফের শিরশিরে রাগের হল্লা বয়ে যায় নওশীনের দেহে, এ নিশ্চয়ই মৌটুসির কাজ। মুনিয়া তার স্নেহ প্রশ্রয় পেলে একেবারে আবেগে আঁকড়ে ধরে মৌটুসিকে, ওকে নিবৃত করতে থামাতে এ জাতীয় ভয় দেখাত মুনিয়াকে। মুনিয়া ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে নওশীনের উপস্থিতিতে ঘাপটি মেরে যেত।

ব্যাপারটা টের পেয়ে সে একদিন ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মৌটুসির ওপর... তুমি ওর বোন হয়ে যদি এসব করো তো বাইরের মানুষ ওকে নিয়ে তামাশা করে মজা পাবে, এ এমন দোষের কী ? তুমি আমার মেয়ে হয়ে কী করে এমন স্বার্থপর হও ?

তুমিও তো স্বার্থপর, ফুঁসে উঠেছিল মৌটুসি, ছোটবেলা থেকেই দেখেছি, ও-ই তোমার জানপ্রাণ, তুমি এক সন্তানকে ভালোবাসো আরেকজনকে বঞ্চনা করো, আব্বু না থাকলে আমি কবে এ বাড়ি থেকে যেখানে খুশি চলে যেতাম। ও-ই তোমার পেটের মেয়ে, আমাকে তো দত্তক এনেছ। বলতে বলতে মৌটুসি কাঁদতে শুরু করলে ভেতর ভাঙাচুরা নওশীন তার চেয়ে দ্বিগুণ কেঁদেছিল, তুমি বড় হচ্ছ না আপু ? তুমি মুনিয়ার অবস্থাটা বুঝ না ? তোমার তো বন্ধুবান্ধবের একটা দুনিয়া আছে, ও কেমন একা, এটা তুমি দেখো না ? বুঝো না ? ছোটবেলায় বুঝতে না, হাজার কষ্ট পেলেও আমি তোমার অবস্থাটা বুঝে যদ্দুর সম্ভব তোমাকে সময় দিয়েছি, আদর করেছি, আর দশটা মানুষের মতো ও সুস্থ না। এজন্যই ওর বাড়তি যত্ন বাড়তি আদর দরকার, আমি ছাড়া আর কে ওকে এটা দেবে ? ছোট থেকে তোমাকে আমি এটা কম বুঝানোর চেষ্টা করেছি ? বলে একেবারে হাল ছেড়ে দিয়ে ওপর দিকে তাকিয়ে বলেছিল, হে আল্লাহ ! আমাকে তুলে নাও... আমি আর পারি না।

সেদিন নানা জট কুয়াশা কেটে কেটে মৌটুসি মা'র কাছবর্তী প্রাণবর্তী হয়েছিল, তার কান্নার মোড় এখন অন্যদিকে, আপু না... আপু তুমি মৃত্যুর কথা বলো না, আল্লাহ তোমার কথা মেনে নিলে আমাদের

কী হবে ? আমি তোমাকে ছাড়া বাঁচব না আম্মু... আমি খেয়াল রাখব মুনিয়ার... কিন্তু ওকে খেয়াল রাখলে আদর করলে ও আমাকে কিছু করতে দেয় না। আমার পড়ার চাপ, পরীক্ষা এসব কিছু বুঝতে চায় না ও। ধীরে ধীরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক স্থিত হয়ে আসছিল। কিন্তু পরিবর্তিত বয়সের মনঃদৈহিক টানাপড়েনের ধকল সামলে নামকরা প্রাইভেট ভার্সিটির ক'দিন পরপরই সেমিস্টার পরীক্ষার ধকলে বেচারি কখনো ইন্টারনেটে কখনো বন্ধুদের সাথে ফোনের ডিসকাসে এত ব্যতিব্যস্ত থাকতে হচ্ছে... ফের তার মেজাজ খিটখিটে হতে শুরু করেছে। নওশীন যে তার এই অবস্থা বুঝে কত মেপে কত হিসেব করে কথা বলে চলে, এ তার গ্রাহ্যের মধ্যেই থাকে না। খেয়াল হয়, দুদিন পরই পরীক্ষা ওর... ক্রমশ ম্লান হয়ে আসে ভেতরটা নওশীনের, নিজের গ্রাহ্য করা তোয়াজ করাটাই মানুষের কাছে ব্যাপক লাগে, মুনিয়ার জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে মৌটুসি ফোনে চেঁচামেচি করে বাড়ি ফেরার জন্য এতক্ষণ তার মাথা খায় নি এটা কি কম ? মৌটুসিও যে কত সন্তর্পণে মা'র এ্যাদ্দিন পর বেরোনোর ব্যাপারটার মধ্যে সহানুভূতি অনুভব করেছে, এটা কম ? দিশা না পেয়ে মুনিয়াকে সেও হয়তো বাধ্য হয়ে ওকে শান্ত করতে পুরনো ভয় দেখানোর পথ বেছে নিয়েছে। এই বয়সী একটা মেয়ের কাছে নিজের মাথার বয়সী সহিষ্ণু স্থিরতা নওশীন আশা করে কী করে ?

মা... আমি আসছি... তুমি টিভিতে কার্টুন দেখো।

মা টিভিতে নেকড়ে মরা শূকর খাচ্ছে... চ্যানেল টিপলেই ছেলেমেয়েরা জাপটা জাপটি অসভ্যতা করছে... আমার ভালো লাগছে না... আমার ভয় করছে।

তুমি কুসুমের কাছে ফোনটা নিয়ে যাও।

আমি এ ঘর থেকে নড়ব না। আমার ভয় করছে। খুব ঝড় হচ্ছে মা, নীলটুনিটা আতাফল গাছে এসে অনেক কান্নাকাটি করেছে, অনেক খুঁজেছে তোমাকে, তুমি এসো মা, ওদের বাচ্চাগুলোকে বাঁচাও।

এটা মা-কে করা মুনিয়ার সহজাত ব্ল্যাকমেইল... ভেতরে একটু স্বস্তি হয় নওশীনের এমন ক্ষেত্রে, না হয় ক্ষণ বিলম্ব না করে শায়েদের দিকে তাকায় নওশীন, বুঝতেই পারছ অবস্থা, আরেকদিন ঠিক এই সূত্র ধরেই কথা বলব, তুমি খেই হারাবে না বুঝলে ? আমি যাচ্ছি।

দাঁড়ায় শায়েদও, কোন সূত্র ? জেনারেশন বদল ? নাকি ওসামা বিন লাদেন ?

তোর মাথায় নারকেল ভাঙব... বলে ছুটতে ছুটতে চলে যায় নওশীন শায়েদের সামনে থেকে, কৈশোরে যেভাবে যেত যৌবনে যেভাবে যেত মধ্যযৌবনে যেভাবে... যেভাবে একই একটা অবয়বের বৃত্ত অদৃশ্য জাদুতে বেঁধে বয়স না বাড়া, না কমা নওশীন দীর্ঘজীবনে আচমকা আসে শায়েদের সামনে আচমকা যায়, সেই ভাবেই।

৯

একরত্তি পাখি নীলটুনির সৌন্দর্য দেখে নওশীন ছাদ চেয়ারে বসে। মুনিয়া কাঠফুলগাছের একটি ভাঙা ডালে দড়ি আর কাঠি দিয়ে একা সেটিং করার উদ্যমে নেমেছে। টোনাটুনি এই ডালটির ওপর বসতেই সবচেয়ে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। বিকেলের হালকা হলুদাভ রঙ বাতাসে রবীন্দ্রনাথ উড়ে বেড়াচ্ছেন তাঁর সার্ধশত জন্মবার্ষিকীতে। এলাকায় প্যাণ্ডেল করে কোথাও রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইছে কেউ... পাগলা হাওয়ার বাদল দিনে—আহা! পৃথিবীর প্রকৃতি রবীন্দ্রময়। খাঁচার মধ্যে বাচ্চাগুলো ডাগর হচ্ছে... উড়ে উড়ে টোনাটুনি ঠোঁটে করে খাবার আনে লাল ঠোঁট হাঁ করে ওরা মুহূর্তে টপাক করে ওদের মুখে খাবার দিয়ে ফের পাক খেতে থাকে বাবা-মা।

পুরুষ টোনার রঙ কালো। রোদ লাগলে তা দেখায় গাঢ় নীল বেগুনি। পেটের মাঝে পিঙ্গল লাল। এত সুন্দর কালো নওশীন দেখেছে কোনোদিন? টুনির রঙ হলুদাভ বাদামি। টোনা দেখতে রূপবান... তার কণ্ঠস্বর এত অপূর্ব... ভোরে ওর গান শুনলে অদ্ভুত এক ঘোরময় নেশা তৈরি হয়। কিন্তু এই যুগলের প্রেমের মধ্যে কখনো রূপ নিয়ে কোনো ঈর্ষার ন্যূনতম টানাপোড়েন দেখে নি নওশীন। টোনাটুনি বাতাসে ঢেউ খেলিয়ে অদ্ভুত আলোর ঝিলিকের মাঝে ছাদের এ গাছ ও গাছ করে ঠিকই বারবার ফিরে যাচ্ছে বাচ্চাদের কাছেই। নওশীন জানে নীলটুনি প্রধানত শীতকালেই বাসা বানায় আর ডিম পাড়ে। কিন্তু এইবার বসন্তের শেষে কোত্থেকে ওরা উড়ে এল নিখুঁত থলের মতো মাকড়সার জালের ভিত করে এর মধ্যে বাস করতে শুরু করল এ ছিল নওশীনের জন্য চমকপ্রদ এক দৃশ্য। আসলে প্রকৃতির মাঝে নগরায়ন প্রযুক্তির ব্যাপক উদ্ভাসনের ফলেই কি না প্রকৃতি সাংঘাতিক ভারসাম্য হারাতে শুরু করেছে।

নভেম্বর যেতে থাকলেও শীতের দেখা মেলে না... এবার ডিসেম্বরে তো দুম করে এমন ঝাকালো শীত নামল... যাই যাই করতেও মানুষের নির্ধারিত না গ্রীষ্ম না বসন্ত কখনোই আবহাওয়া তার সহজাত রূপে বিকশিত হচ্ছিল না।

এ তো লম্বা, ঢ্যাঙ্গা। মুনিয়াটা তো আদতে শিশুর মতোই। নিজে একা করবে এই জেদে যত ডালটাকে বাঁধতে চাইছে তত খেই হারাচ্ছে, এখন ওর এই কাজে কেউ এগিয়ে গেলে কান্নাকাটি করে দুনিয়া ভাসাবে। কিন্তু মজা এই, নীল টোনাটুনি ওর কাজের মাঝেও সেই গাছে গিয়ে বসছে, মুনিয়াকে তাদের কিছু ভয় নেই, অস্বস্তি নেই। এই আপনতাটা মুনিয়ার জগতের একমাত্র বিশাল প্রাপ্তি আর অর্জন... পাখিদের সাথে থাকলে ওর মুখের এই বিস্ময়কর ভালো লাগার মুগ্ধতা চারপাশে আলোকচ্ছটা ছড়ায়। আজ অনেকদিন পর শফিউলকে ছাদে আসতে দেখে নওশীন। পেছনে ট্রে হাতে কুসুম।

আরে তুমি ? ঘুম থেকে কখন উঠলে ?

এই তো বলতে বলতে চেয়ার টেনে বসে শফিউল। বন্ধের দিন দুপুরের ঘুমের অভ্যাসটা পাল্টাতে হবে। ভুঁড়ি বাড়ছে, এছাড়া রাতের ঘুমেরও ডিস্টার্ব হয়। মৌটুসি কই ? এই যে আব্বু আমি আসছি... যেন ধেয়ে আসে মেয়ে। কুসুম চা সার্ভ করতে থাকলে, হাসে শফিউল, আজ জলদি উঠে কুসুমকে চা-নাস্তার অর্ডার দিয়ে ছাদে এসে তোমাদের সারপ্রাইজ দিতে চাইলাম। তোমাদের দেখি তাপ-উত্তাপই নেই।

আরে, ব্যাপারটা হজম করতে দাও। তুমি কুসুমকে বলে এসব ছাদে আনিয়েছ ? ব্র্যাভো! সূর্য আজ কোন দিকে উঠল ?

এই খোঁচার ভয়টাই পাচ্ছিলাম... সূর্য কোনদিকে উঠল... মেয়েদের একই প্যানপ্যানানি...।

সরি... মুহূর্ত গুমোট হতে থাকা হাওয়াটাকে কব্জায় আনে নওশীন... তোমার মুড খারাপ করতে এটা বলি নি বরং আধ ঘুম ভেঙে উঠেও তোমার এই ঝরঝরা মুড দেখে তো আমি তাজ্জব।

কুসুম সালাদ দিয়ে আলুপুরি সার্ভ করছে। মৌটুসি টুনির বাচ্চার খোপর থেকে মুখ বাড়ানোর ক্যাচ ক্যাচ দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে এগুতে যায়, মুনিয়া তুমি করছ কী ? পেছন দিকে হাত উঁচায় মুনিয়া, প্লিজ তুমি এসো না পাখিগুলো উড়ে যাবে, আমি ওদের ডাল বানাচ্ছি। মুনিয়ার এ জাতীয় আচরণ সম্পর্কে ধারণা আছে মৌটুসির। সে আর না এগিয়ে চকলেট খেতে খেতে ছাদে ঘুরতে থাকে।

এত চকলেট খেয়ো না, মোটা হয়ে যাবে... মৌটুসিকে বলতে গিয়েও থামে নওশীন... শফিউল সহজ হালকা মুডের আরামে ডুব দিতে চাইছে, ইস

হাজব্যান্ডের সাথে স্বতঃস্ফূর্ত কথা বলতেও যদি এত বিষয় খুঁজতে হয়? মুহূর্তে ভূমণ্ডল চষে, বলে, সামনে কোনো বন্ধ ধরে চল তোমাদের গ্রামের বাড়ি যাই।

আমিও তাই ভাবছিলাম, হালকা উদ্ভাসন শফিউলের মুখে, মা-ও বারবার বাড়ি যেতে চাইছেন।

আসলে উনি তো জীবনের বেশিরভাগটাই গ্রামে কাটিয়েছেন। নওশীন বলে, এই বাড়িটা তো উনার কাছে একটা খাঁচার মতোনই। আসলে বাবার মৃত্যুর পর তোমার চাচারা সব দখল করে নেওয়ার পর ওখানে গিয়েও উনি শান্তি পান না।

এ নিয়ে ক্যাচাল করতেও ভালো লাগে না, ভাবতেও না... চা'য়ে চুমুক দেয় শফিউল... আমাদের পাঁচ বোন যে যার মতো শ্বশুর বাড়িতে, আমরা তো আর সম্পত্তি আনতে যাব না। মা গেলে উনাকে তারা অশ্রাহ্য করতে পারবে না। মা স্বামীর সম্পত্তি ভিটা নিয়ে যাতে হাপিতেস না করেন তা আমিও বুঝাব, তুমিও বুঝিও। তাহলেই গিয়ে যদ্দিন থাকা যায় তদ্দিনই শান্তি। কী রে মুনিয়া, তুই একটু ক্ষ্যামা দে, আয়, নাস্তা খা, খেয়ে গায়ে শক্তি হলে পরে আবার কাজটা ধরিস।

মুনিয়ার এতক্ষণে যেন হুঁশ হয়, পেছনে বাবা বসে আছে, এবং তাকে ডেকে কিছু বলছে। সে পেছনে ফিরে ভয়ে ভয়ে বাবার মুখ পর্যবেক্ষণ করার চেষ্টা করে, সেই চেহারায় হাসির উদ্ভাসন দেখে হাতের কাজ ফেলে সব ভুলে সে বাবার ওমে এসে ঝাঁপ দেয়।

আসলে মুনিয়ার জন্মের জন্য ন্যূনতম প্রস্তুতি ছিল না নওশীনের মধ্যে, যেমন ছিল না শফিউলকে বিয়ের জন্য। জীবনের এই দুটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ন্যূনতম প্রস্তুতিহীনভাবে কীভাবে হজম করে গ্রহণ করে, এর মাঝে দিয়ে ভেতরে দুর্মর পাথর চাপা বেদনার ভার গোপন করে দুটি কর্মই সম্পন্ন হয়েছে, পরবর্তী সময়ে যতবারই ভেবেছে নওশীনের বিস্ময়কর লেগেছে, অবিশ্বাস্য লেগেছে, যখন এইসব ভাবনার ভারে ফের নুজ হতে শুরু করেছে সন্তর্পণে তৃতীয় একটা নির্ভার জায়গায় নিজেকে দাঁড় করিয়ে ভেবেছে, ওই দুঃসময়টা ও পার করে নি, এরকম অপ্রস্তুতহীন অবস্থার ঝড়টা তার ওপর দিয়ে বয়ে যায় নি, এ অন্য কারও জীবনে ঘটা কোনো কাহিনী, সাধারণত মানুষের জীবনে সহজিয়া প্রক্রিয়ায় এসব ক্ষেত্রে তার যা ঘটার, তাই ঘটেছে। একটি মিথ্যে বারবার বলতে বলতে যেভাবে সত্যটা ওর নিচে চাপা পড়ে যায় সেভাবেও একসময় সেই প্রলম্বিত বেদনার দিনগুলির সত্যটা ক্রমশ মিথ্যে হয়ে হয়ে হয়তোবা মিলিয়ে গেছে। নইলে এত দীর্ঘ জীবনের পথটা সে ক্রমশ ভঙ্গুর হতে থাকা অবয়ব নিয়ে পার হত কী করে?

বাবা চাকরি নিয়ে এ শহর ও শহর করতেন। কোথায় যেন তার মধ্যে ঘরগেরস্থালীর মাঝে থেকেও এক সন্ন্যাসী বাস করত। তা-ই তিনি পরিবার নিয়ে চাকরিস্থলে বাস করা, তাদের সেসব জায়গায় স্কুলে নিয়ে ভর্তি করার বাস্তবতার কথা চিন্তাও করতে পারতেন না। যখন যেখানে চাকরি করতেন আশপাশের লোকজনের সাথে ভাব জমে যেত, কী বৃদ্ধ কী পোলাপান... তাদের নিয়ে কখনো কোনো মাঠে, কখনো উঠোনে, গাছতলায় থিয়েটার করতে মজে যেতেন। রচয়িতা, নির্দেশক, সব তিনি। ও সবের কোনো পাণ্ডুলিপিও ছিল না, একটি করে কাহিনী তৈরি করে যার যার বয়স যোগ্যতা অনুযায়ী তাঁদের বাক্য মুখস্থ করিয়ে কোনো বন্ধের দিন কায়দামতো জায়গা বুঝে একবারই মঞ্চস্থ হতো সেই নাটক। পরদিনই সেই নাটক পৃথিবীর বাস্তবতা থেকে হাওয়া। মাসে মাসে টাকা পাঠাতেন যা, তাতে আমাদের সংসারে প্রতিদিনই আর্থিক নরকের মহোৎসব।

গ্রাম থেকে আগত মা প্রথমে কুলবধূ... এরপর স্বামীর এ হেন উদাস উদাস বাউল আচরণে অবাক হতে হতে শেষে সংসার সামলাতে গিয়ে ক্রমশ লড়াকু হয়ে উঠেছিলেন।

বাবা মাঝে মধ্যে এসে জিজ্ঞেস করতেন নওশীনকে, এই তুই কোন ক্লাসে পড়িসরে?

ক্লাস ফাইভ।

গতবার না শুনলাম সিক্সে... আরে বাহ্! ফাইভে উঠে গেছিস? তোর রোল নাম্বার কত?

ক্লাস নাইনে উঠে একাকী পড়ায় আর দিশা পাচ্ছিল না নওশীন। বৃত্তি দেওয়ার দুর্মর ইচ্ছা। স্কুলের টিচাররা ক্লাসে রিডিং পড়তে দিয়ে সোয়েটার বোনায় ব্যস্ত হয়ে যেতেন।

পড়ার মেসেই ক'জন বন্ধুর সাথে শফিউল থাকত। মা'র আপদে বিপদে প্রায়ই দৌড়ঝাঁপময় কাজে মা-কে সাহায্য করত। এর মধ্যেই নওশীনের পড়াশোনা নিয়ে হিমশিম ভাব দেখে তাকে মাঝে মধ্যে পড়া বোঝাতে আসত সে, তাতেই দুজনের মাঝে একটা সহজিয়া সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। ইস্কুলে যেত নওশীন পায়ে হেঁটে, প্যাঁচানো-ঘোরানো রাস্তা ধরে চলতে গিয়ে তার পা ভারী হয়ে উঠত। বয়েজ স্কুলের সামনের পথটা ধরলে... স্কুলের ছেলেদের টিপ্পনি এখন যার নাম ইভটিজিং তেমনই ছেলেদের উচ্চস্বরে গান আর মন্তব্যে সে প্রায় মাথা হেঁট করে হেঁটে কোনোরকমে নিজের স্কুলের সামনে গিয়ে হাঁপ ছাড়ত... তখনকার চটুল গানের অশ্লীল প্যারোডি হতো... চুমকি চলেছে একা পথে, পাছাটা টিপলে দোষ কী তাতে... শরীরে শিরশির গুগন্ধের বিষ নামত, যুগের পর যুগ ছেলেরা এ রকম কেন? এদের কুৎসিত উৎপীড়ন যৌন নির্যাতনের রকম যুগে যুগে ভয়ঙ্কর হওয়ার পর এখন ইভটিজিং নামের একটি সুন্দর ধ্বনিযুক্ত শব্দের মধ্যে ওদের লুচ্চামি যেন সোনালি মোড়কে একটি উচ্চতা পেয়েছে। যা হোক ছেলেদের প্রতি এরকম বিতৃষ্ণা ঘৃণা নিয়ে এগোতে গিয়ে একদিন এক নির্জন রাস্তা ধরে পেরোনোর পথে সে একটি ধ্বনি শোনে, এক্সকিউজ মি।

ছেলে কণ্ঠ শুনে জোর হাঁটা দিলে নওশীনকে অতিক্রম করে একটি ছেলে এসে দাঁড়ায়, শোনো, আই সরি...মানে... দুর্মর ভয় নিয়েই ভেতর ক্রুদ্ধতায় রীতিমতো ফণা তুলে তাকায় নওশীন, একটি অদ্ভুত মায়াবী মুখ, চোখে বিষণ্ন কাতরতা দেখে একটু থমকালেও পরক্ষণেই রাগে ক্ষোভে কান্না এসে যায় নওশীনের, এইরকম ভদ্র মুখ নিয়ে এমন নোংরা নোংরা কথা বলে এখন সরি বলছেন? প্লিজ যান, আপনি প্লিজ কোনো মতলব নিয়ে এসে থাকলে তা করবেন না, আমি আর সহ্য করতে পারব না। গলায় দড়ি দিয়ে মরে যাব। ছেলেটি কী বলতে গিয়ে ভড়কে যায়। তার গলায় হেঁচকি জমলে নওশীন একটি শীতল চাউনি তার ওপর নিক্ষেপ করে চলে যায়। নওশীনের পেছনে তখন বুলবুলির মৃত্যুর আচ্ছন্নতা, দীর্ঘ শয্যাশায়ী পড়ে থাকা মায়ের মধ্যে দুর্মর দাঁড়ানোর ইচ্ছা। সদ্য হাঁটতে থাকা শিশুর মতো এক পা হাঁটে তো দুপা পড়ে। মেজপার কাছে পড়াশোনা একটা বিষাদের জায়গা... এই ফাঁকে সে পড়া বাদ দিয়ে মা'র সেবায় লিপ্ত... তখন মা-কে দেখেছে নওশীন, প্রায়ই প্রচণ্ড বিমর্ষ বিপন্ন আঁধার মুহূর্তে... বংশের বাত্তিটাত্তি কিচ্ছু না। আইজ আমি মরলে ফেরেশতারা যখন জীবনের হিসাব চাইব... বংশের বাত্তি জ্বালায়া কোনো পোলার শক্তি আছে বাপ-মায়েরে বেহেশতে নেয়? তোর বাবার যে উড়ন স্বভাব, একটা পোলা হইলে নিজ হাতে তারে আমি পোক্ত বানাইতাম... তোর বাবার মতন হইতে দিতাম না... বাইরের দুনিয়ায় ঘুইরা সে সংসারের হাল ধরতে পারত। এখন তোদের কেমনে পড়াই কেমনে কার কাছে বিয়া দিই...।

মা ছিলেন ফাইভ পাস। নওশীনের চেনা-জানা মফস্বলের পৃথিবীতে তখন সে তার স্কুলের কয়েকজন মাস্টারনি ছাড়া

আর বয়সী কাউকে বাইরে গিয়ে কাজ করতে দেখে নি। কিন্তু এর মাঝেই মা চাইতেন মেয়েরা যেভাবে পারে পড়াশোনা করে নিজেকে যোগ্যপাত্রের জন্য ন্যূনতম হলেও তৈরি করুক। কিন্তু কঠিন দারিদ্র্য মা'কে এই ভাবনা থেকে ছিটকে দিতে থাকে অথই জলে পড়ে মেয়েরা যাতে নষ্ট সাগরে না ভেসে যায়। তখন মেয়েদের বয়স যোগ্যতা সব ভুলে তাদের যেভাবেই হোক বিয়ের জন্য তৎপর হয়ে পড়েন।

বড়পা সেলাইফোঁড়াইয়ের ফাঁকেও তাও পড়া চালাচ্ছিল, আর পরিবারকে যতই বিপর্যস্ত দেখছিল বাবার মধ্যে পলায়নপরতার ভূত ততই চেপে বসছিল। তাকে দেখে নওশীনের রাগ হতো যত পরিবারের দুরবস্থার সামনে অসহায় মুখ নিয়ে বসে থাকা বাবার জন্য মায়াও হতো তত। কেন যে এমন বাউল বাউল মনের লোকটাকে দাদাজান একেবারে ধমকে কুঁদে বিয়ে, পরিবারের মধ্যে বাঁধলেন!

ছায়াচ্ছন্ন জীবাশ্মের স্তূপে কখনো নিঃশব্দ প্লাবণে ভেসে কখনো দিন তো গড়ায়। নওশীনদের গলির এক মাথা রেললাইনে গিয়ে ঠেকেছে। ওটা টপকালে আরেকটা গলি। এর মাঝে একদিন নওশীন গলির মুখে দাঁড়াতেই ট্রেন আসে। এ এক মজা নওশীনের। এক-একটি বগি মানুষ ভর্তি করে যায় আর নওশীনের মাঝে সেই বগিতে বাসরত অচেনা মানুষদের পরিবার জগৎ গন্তব্য নিয়ে ভাবনা তৈরি হয়। কোনো বাচ্চাকে জানালায় দেখলে হাত নাড়ে নওশীন প্রত্যুত্তরে উচ্ছসিত শিশুটির প্রতিক্রিয়া দেখার আগেই সাঁ করে আসে আরও আরও একটি বগি, একজন ক্ষয়িষ্ণু বৃদ্ধা... মৃতচোখে চেয়ে আছে বাইরের দিকে ? আহারে! কী এত বেদনা বৃদ্ধার ? ছেলে খেতে দেয় না ? বউ ঝামটা মারে ? এমনই এক বগি তামশা দেখার ফাঁক-ফোঁকরে আচমকা চোখ যায় ওপাশের গলিতে... করুণ চোখ নিয়ে তাকিয়ে আছে ওই ছেলেটা। ট্রেনটা চলে যাওয়ার পরও সে স্থির দাঁড়িয়ে। নওশীন মুহূর্তে ওকে তাচ্ছিল্য করে রেললাইনে ওঠে। এরপর ওই গলিমুখী না হয়ে কাঠের স্লিপার টপকে টপকে অনেকটা দূরের পথ ধরে।

এরপর প্রায়ই এমন ঘটতে শুরু করল। সন্ধ্যসৌফ ওঠা ঢ্যাঙ্গা লম্বা ছেলেটা আর মেয়েটা প্রায়ই মুখোমুখি হয়, ফের উল্টো পথ ধরে। সেই প্রথম অন্য এক অনুভবে ছেলেটাকে নিয়ে ভাবনার বিলোড়ন ওঠে, এই ছেলেটিও কি ওই স্টুডেন্টদের সাথে রোজ তাকে এমন মর্মান্তিক লজ্জায় ফেলেছে ? কই, ছেলেটির আচরণে চলায় স্থিতভায় কোথাও তো সেই ছেলেদের উত্তেজক হল্লোড় নেই ? তবে ? নওশীন তো ঘাড় তুলে কোনোদিন কাউকে দেখে নি। নিশ্চয়ই এ-ও ছিল ওই দলে নইলে সরি বলল কেন ? কিন্তু তারপর সে আর না এগিয়ে এমন নিশ্চুপভাবে নওশীনের দিকে তাকিয়ে থাকে কেন ? কেন নওশীনের ভেতর ওর অবয়ব ভাবামাত্রই অদ্ভুত কাঁপনের অচেনা শিহরণ ?

স্তব্ধতা ঠেলে দুর্মর আগ্রহে একসময় দাঁড়ায় ওর সামনে, আপনি সেদিন সরি হয়েছিলেন কেন ?

ছেলেটি মুহূর্তে ঘাবড়ে যায়, পরক্ষণেই নিজেকে ধীরে ধীরে সামলে শান্ত কণ্ঠে বলে, আমার সহপাঠীরা আপনাকে অপমান করে, ওরা আমার বন্ধু না, ওদের সাথে লড়ার মানসিকতা শক্তি কিচ্ছু আমার নেই, কিন্তু ওরা আমার সহপাঠী তো তাই ক্লাসমেটদের পক্ষ থেকে আমি সেদিন...

সে এক অদ্ভুত প্রেম হয়েছিল দুজনের মাঝে। ওই সময় দিন তরঙ্গের রঙ যত জিভ দিয়ে ছোঁয় ততই ভূমণ্ডলে কাঁপন... আপনার নাম কী ?

সুদীপ্ত।

১০

যেদিন জানল, তখন নওশীনদের মফস্বলে কালার টিভি এলেও, পার্কের মধ্যে যুবক-যুবতী চুমুচালাচালিরত প্রেম করলেও, ঘরে ঘরে ছেলেমেয়েদের স্কুল-কলেজে দাপটের সাথে যাওয়ার বাস্তবতা থাকলেও, প্রেমের বিরুদ্ধে বাবা গেলে ভেগে গিয়ে কেউ কেউ বিয়ে করে সংসার পাতলেও নওশীন আর সুদীপ্তর প্রেমটা তার মায়ের আমলের মতো ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট আবহেই চলতে থাকল। নওশীন যখন ক্লাস সিক্সে, নিজের নাম জানিয়ে নিজের ক্লাসমেটদের পক্ষ থেকে সরি হওয়ার বিবরণ দেওয়া সত্ত্বেও ভেতরের দুর্মর আবেগ প্রকাশকে দামি করতে নওশীন ঠোঁটে ঝুলাল তাচ্ছিল্য...অ তো আপনি আগেই এটা বললেই পারতেন, এমন বোকার মতো রোজ রোজ দাঁড়িয়ে থাকার কী দরকার ছিল ? এমন করে হাঁ করে তাকিয়ে কী দেখেছেন ?

ভীষণ অপ্রস্তুত সুদীপ্ত যে অপমানের ঘা খেয়ে ছিটকে পড়বে নওশীনের কল্পনাতেও ছিল না। তার জীবনে এমন ছিন্নমূল জাগতিক জীবনে এমন হাহাকার ছিল অহঙ্কার ছাড়া আর কোনো অবলম্বন ছিল না, যা ধরে সে দাঁড়ায়। আর একটা মেয়ে যত তাচ্ছিল্য করবে তাকে কাঙ্ক্ষা করা পুরুষ তার দিকে ততই ছুটবে, এই ধারণাটাই তখন তার চারপাশের পৃথিবীতে বদ্ধমূল ছিল।

সেদিনের পর সুদীপ্ত হাওয়া।

আর তদ্দিনে তাকে টিপ্পনী করা ছেলেরা হাল ছেড়ে নতুন কারও পেছনে লেগেছে। কিন্তু এক ভয়ঙ্কর তিক্ত ভয় সেই স্কুলের সামনে তার মাথাকে উঠতেই দেয় না। রাত রাত দুঃসহ দহনে পুড়ে সে দিন দিন খোঁজার তাড়নায়...সাহস করে তাকায় মাঝে মধ্যে বয়েজ স্কুলের দিকে... সুদীপ্তর দেখা নেই।

জীবনটা কয়লা কয়লা হয়ে গিয়েছিল।

ঘাস ফুটছিল... যা-ও একটু... সুদীপ্তের অন্তর্ধানে পুরো চারপাশ মরুভূমি হয়ে গেল।

ক্লাস সেভেনে ফের একদিন দেখা।

একটি পত্রিকা হাতে করে সুদীপ্ত এসে দাঁড়ায় নওশীনের দরজায়। যেখানে রাজধানীর পত্রিকায় নওশীনের লেখা প্রকাশ হয়েছে।

ইতোমধ্যে ধাক্কা-গুত্তা খেয়ে খেয়ে মুসলিম ইনস্টিটিউটের লাইব্রেরি থেকে আনা কিছু বই পড়ে রাত জেগে জেগে বেগম রোকেয়ার জীবনীর প্রেরণায় বিভিন্ন পত্রিকায় লেখা পাঠাতে শুরু করেছে নওশীন। সুদীপ্তর আগমন আর অন্তর্ধানের বেদনক্ষরণ উঠতি বয়সের কিশোরীর মাঝে বুলবুলিকে হারানোর বেদনাকে হালকা করে দিয়েছে।

জিন্সের প্যান্ট পরা মাথায় স্কার্ফ বাঁধা মেয়েটিকে সহসা চিনতে পারে না নওশীন। কিন্তু তখন তাকে ডাকছে নতুন, তাকে ডাকছে উদারতা, হাজার হাজার প্রশ্ন তার মনে, যার উত্তর দেওয়ার মতো কেউ নেই। মামার স্ত্রী, সে সময় শুধু বাবা-মা'র অমতে বিয়ে করেছে তা নয়, মামাকে নিয়ে সে এই শহরে এসে নিজের মতো করে দিব্যি একটা সুখের সংসারও পেতেছিল। সেই নারী পরকীয়ায় জড়িয়ে স্বামীকে ত্যাগ করে আলাদা সংসার পেতে তখন শহরে রীতিমতো হুলোস্থুল বাঁধিয়ে দিয়েছে।

আপন আত্মীয় কেউ তার বাড়িতে যায় না, গেলেও কুৎসিত বাক্য শুনিয়ে আসে। নওশীনের তখন সুদীপ্তর অন্তর্ধানের পর নিজের দৈন্য-বিপন্ন লুকাতে দুর্মর বিলোড়ন, কী করে একটু ভিন্ন হওয়া যায়, কী করলে সে অন্যদের থেকে আলাদা হিসেবে চিহ্নিত হবে, কী করলে এই শতচ্ছিন্নতার মধ্যেও তার ওপর কোনো ভিন্নতার কোন সুন্দরের মনোযোগ দৃষ্টি পড়বে, নওশীন এইসব বিলোড়নের মধ্য দিয়ে চলছিল। এর মাঝে চিটাগাং ভার্সিটি পড়ুয়া নওশীনের মামা করাচি ফেরত মেয়ে সুমাইয়াকে বিয়ে করে এনে এমনিতেই পরিবারে বেশ আলোড়ন তুলেছে। অপূর্ব রূপসী সেই মামি-কে গোপনে দূর থেকে দেখত নওশীন, মনে

হতো এত সুন্দর স্মার্টনেসের সামনে দাঁড়ানোর যোগ্যতাটুকু নেই তার। কিন্তু ওই ছিন্নমূল অবহেলার জীবনে ছাত্রাবস্থায় আশৈশব ছুটিতে আসা মামার উদাত্ত স্নেহ থেকে নওশীন কোনোদিন বঞ্চিত হয় নি।

বিয়ের ক'মাস গড়াতেই নিজের শাড়ির গেটআপ পাল্টে মামি যত নানাবিধ ফ্যাশনে নিজেকে সাজায় তত সমাজ থেকে তার দূরত্ব বাড়ে। এর মাঝে একদিন করাচি ভার্সিটিতে মামির সাথে পড়ুয়া এক বাঙালি যুবক এসে মামিকে উড়িয়ে নিয়ে চলে গেল।

স্পষ্ট মনে আছে নওশীনের একদিকে দেবদাস হয়ে যাওয়া মামাকে নিয়ে পীড়ন অন্যদিকে কী এক নিষিদ্ধ বিষয় জানার আকর্ষণে বুকে কষে সাহস বেঁধে সে স্কুল ফাঁকি দিয়ে অনেকটা পথ হেঁটে শহরের মাঝখানের কলেজ রোডের সুমাইয়া মামির বাড়িতে কড়া নেড়েছিল। কী বলবে কী করবে কোনোরকম প্রস্তুতি ছাড়াই। জানালার পর্দা উঠে, গ্রিলের ওপাশে সুমাইয়ার তিক্ত মুখ... এই তুমি কে ? কেন এসেছ ?

একটু খুলবেন দরজাটা ?

কারা পাঠিয়েছে তোমাকে ?

কেউ না। আমি নিজেই এসেছি।

কণ্ঠের নিম্নমানের অসহায়তা অনুভব করেই বা যেন কেন যেন দরজা খুলে দিল সুমাইয়া। ভেতরে জীবনের প্রথম দেখা বইপত্তর আর আর্ট কালচারে মুখরিত ড্রয়িংরুমটিতে বসে টের পায় নওশীন কণ্ঠ শুকিয়ে যাচ্ছে।

হ্যাঁ বলো, কেন এসেছ ?

মহিলার ভেতর রাজ্যির বিরক্তি, মানুষের গঞ্জনা... অশ্লীল অভিসম্পাত শুনতে শুনতে যেন ক্লান্তির সাথে অনেকটা হিংস্রও।

আপনি মামাকে বিয়েই করেছিলেন কেন ? ছাড়লেনই বা কেন ?

যেন ভূকম্পন হয়... ও ? তুমিও ওখান থেকে এসেছ ? বলে সরোষে দাঁড়ায় সুমাইয়া, বদমাশ সব নিজেরা কচলে শান্তি পায় নি এখন একটা বাচ্চাকে পাঠিয়েছে। যাও... বেরিয়ে যাও।

দেখুন... আপনি শান্ত হোন, আমাকে কেউ পাঠায় নি... আর দয়া করে আমাকে বাচ্চা বলবেন না.. কী করে কীভাবে যে কথাগুলো বলে যাচ্ছিল নওশীন নিজেই জানে না...আমার কোলে আমার মায়ের গর্ভে জন্ম নেওয়া একটা বাচ্চা জন্ম নিয়েছিল... আমি ওর মা হয়েছিলাম... আমার কোলের ওপর সে মারা গেছে। বলতে বলতে বিহ্বল বোধ করে সে, এখানে এসে এসব কেন বলছে সে ?

কিন্তু কী জানি কেন এই পারস্পরহীন কথায়ও চারপাশে অপার স্তব্ধতা নেমে আসে রুমে।

সুমাইয়ার চোখে এইবার বিস্ময়... তা তুমি কেন এসেছ ?

আমি আপনাকে দূর থেকে অনেক দেখেছি ঢোক গেলে নওশীন... আপনি আমার কাছে একটা স্বপ্ন... যিনি আমার মামা আমরা তার আপনজন, তার কাছের মানুষ, আমরা কী করে দেখব ? জাস্ট আমার জানার কৌতূহল, আপনি মামাকে ছেড়ে কেন... ?

এরপর পুরো ঘরের হাওয়াই গেল পাল্টে... পরিবেশটা আচমকা এমন বিষণ্ন হয়ে উঠল ধুরন্দর বাতাসেরও সাধ্য ছিল না এর মাঝে প্রবেশ করে। নওশীন দেখে সুমাইয়া তাজ্জব হয়ে একটি শিশু নামক অবয়বের মাঝে আরও কিছু খোঁজার চেষ্টায় তৎপর হয়ে বলে, তুমি কোন ক্লাসে পড় ?

সেভেনে উঠেছি।

তোমার বাবাই তো ওই যে বাউল বাউল টাইপের... ?

মামা আপনাকে বলেছে ? নওশীন উচ্ছ্বসিত। আপনি কী করে বুঝলেন আমি তারই মেয়ে ?

এমনিই বুঝেছি... বলে ভেতরে কিছুক্ষণ গুম মেরে থেকে বলে... আমি কী করে তোমাকে কী বুঝাই, কী তুমি বুঝবে... বলে যেন নিজের অনেকদিনের বেঁধে রাখা অপমানিত যন্ত্রনায় কাতর হয়ে ভেঙে পড়ে যেন নওশীন নয়, প্রকৃতির সামনে স্বগতোক্তি করছে এমনভাবে যেনবা স্পষ্ট অপষ্ট বিড়বিড় করে... লোকটা নপুংসক ছিল... নারীর সাথে বিছানায় শোয়ার যোগ্যতা তার ছিল না... এর মধ্যে কুৎসিত মন... কথায় কথায় সন্দেহ ...।

এই ব্যাপারগুলো নওশীন জানত। যেখানে গ্রামে মফস্বলে মেয়েদের বিষ গিলে হলেও স্বামী-সংসার সামলে সংসার করার শিক্ষা দেওয়া হতো পরিবারে, সেখানে নওশীনের এক ফুপুকে বিয়ের পরের সকালেই তাদের বাড়ির লোকজন শ্বশুরবাড়ি থেকে নিয়ে এসেছিল স্বামী 'নামরদ' হওয়ার কারণে। বড়রা এইসব কথা যত চাপা উচ্চস্বরে বলত ছোটদের সরিয়ে দিয়ে তত বেশি শিশুরা সেসব কথা জোরালভাবে শুনতে পেত।

আপনি কেন এইভাবে বলছেন ? ততক্ষণে নওশীন এই বাড়ির সমস্ত প্রাচীর ডিঙিয়ে অনেকটা সহজতায় আসার যোগ্যতা আর্জন করে ফেলেছে... আমার মামার যদি সেই ক্ষমতা না থাকত দুবছর আপনি কী করে তার সাথে হাসিখুশি ছিলেন ? এরপর—এখনো ভাবলে শিউরে ওঠে নওশীন, ও বয়সে নিজেকে আলাদা তাজ্জবময় করার লোভ কীভাবে এমন গভীর কথা বলিয়েছিল তাকে... হতেই পারে মামার সাথে আপনি আর এডজাস্ট করতে পারছিলেন না, আপনার করাচির বন্ধু আপনার মনের মধ্যে রয়ে গিয়েছিল, আপনি তার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে এতবড় একটা ঝুঁকি নিয়েছেন, একজনের কাছে যাওয়ার জন্য আরেকজনকে ঘৃণা করার কারণ খুঁজতেই হবে ? তার নামে উল্টাপাল্টা বাজে সমাজে তাকে পচাতেই হবে? মানে যাতে আপনি যা করেছেন সেটা জায়েজ হয় ? আসলে আমি সত্য কিছুই জানি না। ক'দিন যাবত মাথায় এই কথাগুলো ঘুরছিল তো... তাই...। নওশীন তখন কোন ছায়ায় মুহ্যমান সে জানে না, কোন সে শিলাপাথরে তার কোন অবয়ব গড়াচ্ছে জানে না। ঘরের প্রচ্ছায়ায় বিমূঢ় হয়ে থাকা সুমাইয়ার মুখটাও দেখতে পারছিল না বুক ধরকের শব্দে... কেবল হালকা ভেজানো দরজায় একজন দণ্ডায়মান পুরুষের নড়নের শব্দে একটা কাঁপন হয় শুধু ... দেখে মুখে চাপদাড়ি কাঁধ অব্দি নজরুলের মতো ঝাঁকানো চুলের একজন মানুষের বিস্ময়কর গভীর চোখ...বুঝতে পারে নওশীন ইনিই সুমাইয়ার হাজব্যান্ড.. পুরো পরিবেশটা বজ্রাহতের মতো হয়ে গেলে আচমকা নিজেকে টান দেয় নওশীন... এবং ওদের কিছু বলার প্রস্তুতি না দিয়েই ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে আসে।

পরদিন স্কুল থেকে বেরিয়ে দেখে ওই নিঃসীম কোলাহলহীন রিকশাময় গাড়িতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সুমাইয়ার হাজব্যান্ড।

তাকে দেখে পায়ের নিচের মাটি সরে যেতে থাকে নওশীনের। এরকম একটি পথে এরকম একট দৃশ্যের জাঁকালোতায় অস্বস্তি বোধ করে প্রায় ছুটতে ছুটতে পেছনে আসেন ভদ্রলোক। কিছুটা পথ ছায়াছন্নতার মাঝে যায়, এর পর তিনি ধীরে শুরু করেন, আমি বেশি সময় নেব না। তুমি চলে আসার পর সুমাইয়া অনেক কেঁদেছে। সত্যিই তুমি একটা বিস্ময়কর মেয়ে, দেখতে হবে না কার সন্তান তুমি ? মঞ্জুভাইয়ের মনের উদারতাটা তোমার মাঝেও উনি ছড়িয়ে দিয়েছেন। তুমি প্লিজ আরেকবার এসো আমাদের বাসায়। সুমাইয়া খুব করে আমাকে বলেছে।

পাশের পরিষ্কার ড্রেনে সদ্য চলে যাওয়া বৃষ্টি স্রোতের ধাবমানতা... মাথার ওপর চিরল চিরল কড়ইগাছে পাতা... সে দুটা বই দেয় নওশীনের হাতে, তোমার লেখার নেশা শুনেছি... পড়তে দিলাম।

আপনি আমার বাবাকে এতটা চেনেন ? কীভাবে ?

আশ্চর্য! উনিই তো আমাদের বিয়ে দিয়েছেন। উনি না থাকলে আমাদের দুজনের আদৌ কিছু হতো কি না জানি না।

১১

সুদীপ্ত পেপার নিয়ে যেদিন এল নওশীন নিজ জগতের এই নিঃশব্দ বিলোড়ন নিয়ে সন্তর্পণে পরিবারের সবার মাঝে থেকেও ভীষণ গোপনতায় অস্থির ছিল। সুদীপ্তর আগমন সেই তরঙ্গকে উসকে দিল। প্রকাশিত যে লেখাটি সে নিয়ে এসেছিল তার, তা সে সময়ের জনপ্রিয় *কিশোর বাংলায়* সদ্য প্রকাশিত। যেখানে ট্রেনের এপার, ওপারে দাঁড়ানো দুজন বন্ধুর কহন ছিল, সেখানে কৈশোরিক বন্ধুত্বের মাঝে সত্যের সাথে মিথ্যার মিশেলে ভুল বুঝাবুঝির প্রেক্ষিতে একজনের অন্তর্ধানকে কেন্দ্র করে নিঃসঙ্গ বেদনার কথা বর্ণিত ছিল। দরজায় সুদীপ্তকে দেখে নওশীনের ভেতরে দুর্মর কাঁপনময় রোমাঞ্চকর অনুভূতি হলেও সে আচমকা দুমড়ে যায় যে, তার পেছনের শতচ্ছিন্ন ঘর দারিদ্র্যের রূপের কথা ভেবে... এর মাঝে সেদিন বাড়িতে তার ভীষণ রক্ষণশীল মানসিকতার বড়পাকে নিয়ে ভয়টা এতই ছিল যে, সে দরজা পেছন থেকে ভেজিয়ে কক্ষের সামনের সিঁড়িতে নেমে করুণ মুখ করে তার দিকে তাকিয়েছিল দুবছর আগে স্বপ্নের মতো কচি পরানের মধ্যে প্রগাঢ় দাগ ফেলে যাওয়া রাজপুত্রের দিকে।

ইতোমধ্যে পাড়ার ক'জন মুরব্বির মনোযোগ এদিকে আকর্ষিত হলে সে আবহটা আঁচ করতে পেরে পত্রিকাটা নওশীনের দিকে এগিয়ে সন্তর্পণে একটি চিরকুট গুঁজে দিয়ে যেন বাতাসে মিলিয়ে যায়।

হ্যাঁ। রোমাঞ্চ! পত্রিকায় লেখা ছাপা হওয়ার চাইতেও দুর্মর ওই চিরকুট... এর মাঝে মধ্যবিত্তের প্রায়ই বাধাহীন জীবনে জীবনের ওই পর্যায় পর্যন্ত আসতে আসতেই সে। বৃদ্ধ... জোয়ান নানা ধরনের পুরুষের স্নেহময় স্পর্শের মধ্যে কুৎসিত বুক পেছন টেপা অশ্লীল গুঁতোও পেয়েছে... যখন এমন কাণ্ড কেউ করত সম্পর্কে তারা মুরুব্বি অথবা আত্মীয় পরিচিত যে-ই হোক... সবার সামনে এই স্পর্শে তাদের মুখে লটকে থাকত হাসিমাখা স্নেহ... তা টপকে এ নিয়ে প্রতিবাদ করার মতো সাহস অবস্থা কিছুই নওশীনের থাকত না।

কিন্তু সুদীপ্তর অন্তর্ধানের পর ভেতর বিরহের ক্ষরণ পুড়নের নয়া অনুভূতির হাহাকারের মধ্যে হুড়মুড় করে এসে পড়া সুমাইয়াদের ঝাঁকাল অভিজ্ঞতা নিয়ে হিমশিম খেতে খেতেই হারিয়ে যাওয়া প্রেমময় মানুষটার চিরকুটের সাথে এই একফোঁটা আঙুল স্পর্শ... নতুন রোমাঞ্চে কাঁপিয়ে দিল নওশীনকে। কত গোপনে সেই ঝাঁকড়া আতাফল গাছের আড়ালে বুক ধরক ধরকের মধ্যে পড়া... তোমার গল্প আমাকে নাড়িয়ে দিয়েছে... আমি কলকাতা চলে গিয়েছিলাম... তোমার অগ্রাহ্য আমাকে অপমান করেছিল, কষ্ট দিয়েছিল, দেশে ফিরে তোমার এই গল্প পড়ে আমি দেহে প্রাণ পেলাম। তুমি রাত দশটায় রেললাইন চত্বরে এস।

এরপর এক ভয় সাহস আর অভিজ্ঞতার মিশেলে ভয়াবহ যাত্রা... ক্লাসে.. পাড়ায় কোথাও কেউ নওশীনের সই হয়ে উঠে নি... নিজ বিষণ্ন বেদনার নির্জনতায় সে পেরে উঠে নি কারও সাথে নিজেকে মেলে ধরতে বা অন্য কাউকে তার সামনে মেলে ধরতে দেওয়ার অবকাশইও। কিন্তু শীতের এই হিমরাতে কী করে সে রাস্তা পেরিয়ে একাকী ওই অতরাতে রেললাইনে যায় ? যেখানে শহরের বেশির ভাগই হারিকেন জ্বালায়। মফস্বলে রাত আটটা পেরোলেই ঘুম নেমে আসে। নিজের মধ্যে জ্বর কাঁপন নিয়ে যাবে কি যাবে না এই তর্কে ক্লান্ত হয়ে অনুভব করেছিল প্রেম মানুষকে কেমন সাহসী করে! এই ভাবনার পর নিজ জীবন যাপনের প্রতি ক্রমশ ঘেন্নার সাথে কাজ। সাথে একটা জেদও... সুমাইয়ারা এত কিছু পারলে সে একা ভয় পেয়ে পেয়ে এই নিকৃষ্ট জীবনের পচনে নিজেকে ডুবিয়ে রাখবে কেন ? আর যে আত্মাভিমান সুদীপ্তর, আজ না গেলে তাকে চিরদিনের জন্য হারিয়ে ফেলবে নওশীন। যা সে সেই জীবনে কল্পনাই করতে পারছিল না।

মুহূর্তগুলো কাটছিল ঘণ্টার মতো। বড়পার হাতঘড়িটা সন্তর্পণে মাথার কাছে রেখে নিঃশ্বাস বন্ধ করে পড়েছিল অনেকক্ষণ। সবাই ঘুমিয়ে গেলে হাতে বদনা নিয়ে নিভু হারিকেনের সলতে উস্কে বাইরের বাথরুমে যাওয়ার ভঙ্গি নিয়ে উঠোনে দাঁড়িয়ে ছিল।

রাধা শীতের প্রতিটি প্রহর কুয়াশা আঁধার পেরিয়ে কী দুর্মর আগুনকাঁপন দেহ নিয়ে কৃষ্ণযাত্রা করেছিল সে-ই জানে।

আঁধারে বসেছিল সুদীপ্ত।

ভয় পেয়েছিল সামনে যাওয়ার পর, হুড়োহুড়ি তাড়ার মধ্যে যদি সুদীপ্ত ওর দেহে ঝাঁপ দেয় ?

আহারে! কী করে এরকম প্রেমের রাতেই কুয়াশার মাখন ছায়া ভেদ করে পূর্ণচন্দ্র ওঠে ? রেললাইনে নিঃশব্দে বসেছিল সুদীপ্ত। এরপর ওর যেন ভয় নেই, তাড়া নেই... সারা দিন সারা রাত কথা বলবে এই মুড নিয়ে জানিয়েছিল তার কাহিনীকথন... এদেশে তার নানা আর পশ্চিমবঙ্গে তার দাদার প্রচুর প্রোপার্টি আছে। পশ্চিমবঙ্গেই তার জন্ম... আচমকা তার মায়ের মৃত্যুর পর সে আধপাগল হয়ে উঠেছিল... তার

এদেশের নিঃসন্তান খালার আদরে স্নেহে শান্ত হয়ে তার সাথেই এদেশে এসেছে...। ব্রাহ্মণ সমাজে তাদের প্রচুর সম্মানীয় দাম্ভিক অহঙ্কার আর সংস্কারের বেড়াজালে বড় হতে হয়েছে। রাতের ভয় চূর্ণ করে ক্রন্দনময় হাহাকার উঠেছিল নওশীনের মধ্যে, তুমি হিন্দু ?

না... আমি মানুষ। ধর্মের বাড়াবাড়ি তোয়াক্কা না করে আমার বাবা সিপিএম করে... আমি এ্যাদ্দিন তার ছায়ায় থেকেছি... বাবার সাথে স্লোগানে গিয়েছি, গান গেয়েছি... রাত জেগে বাবাকে রঙতুলি এগিয়ে দিয়ে পোস্টার লিখতে সাহায্য করেছি... এর বিরুদ্ধে মা আমাকে যথাসাধ্য নিজের মতো ঘরসংসারমুখী করে নিজ সংস্কারে মানুষ করেছিলেন... তার মৃত্যুতে আমার যা হওয়ার হলো, দাদা-বাবার কাছে আমাকে ছাড়ার ভরসা আর পেলেন না।

কৃষ্ণ রাধার পূর্ণিমা রাতের অভিসারে অপার্থিব ফুলঘ্রাণ এর মাঝেও কীসব শব্দাবলী... কিন্তু প্রকৃতি আর নিস্তব্ধ রাত ঘোরের মাদকতার শক্তি অপার্থিব। মাঝে একটা ট্রেন এসে নওশীনের বুকে জমে থাকা এতক্ষণের তীক্ষ্ণতা মাড়িয়ে চলে গেলে হিন্দু-মুসলমান বেদন পুড়ন সব ফিকে হয়ে যায়... ঘোর চোখে নওশীনের দিকে তাকায় সুদীপ্ত। আর জোৎস্নায় প্রচ্ছায়ায় সুদীপ্তকে এমন লাগতে থাকে ওকে চিরকালের জন্য পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় যখন ওর ঠোঁটের দিকে এগোচ্ছে নওশীনের ঠোঁট... ওকে আমুল জড়িয়ে কম্পনে পুড়িয়ে ছাড়খার করে গভীর চুম্বনের দিকে আসছে সুদীপ্ত নিজের সত্তাকে নিজের মধ্য থেকে রক্তাক্তভাবে বিচ্ছিন্ন করে...।

নওশীন যেন জীবন থেকে জীবনকে, সত্তা থেকে সত্তাকে সেই মুহূর্তে এক অদ্ভুত ভয়ে বিযুক্ত করে, নইলে দুজনের যে দশা হয়েছিল... রেললাইনের ওপরও যদি দুটি মন দেহ সাপের মতো কুণ্ডলী পাকাত, দুজনের হুঁশের মধ্যেই থাকত না, কী হচ্ছে, কিন্তু এক পর্যায়ে দুর্মরভাবে সচকিত হয় নওশীন না-না সুদীপ্ত... এ ঠিক না... আমাদের প্রেম হয় নি... বিয়ে হয় নি...এ খারাপ।

পরে বুঝেছে নওশীন নিজের সাথে, নিজের গভীর অনুধাবনে, সে আসলে সুদীপ্ত'র মধ্যে নিজের আরও দীর্ঘমেয়াদি প্রগাঢ় ছাপ রাখার জন্য এমনটা বলেছিল... করেছিল। ও জানত, যে মেয়ে এসব ব্যাপারে যত সাবধানী, যে-কোনো পুরুষমন তার প্রতি তত সম্মান, আকর্ষণ বোধ করে।

কিন্তু সে রাতে একী চোখ সুদীপ্ত'র ? নিষ্ঠুর অপমানবোধে সে হতবাক হয়ে অস্ফুট কণ্ঠে একটি কথাই বলেছিল, কী ভেবেছিলে তুমি, আমি তোমাকে নষ্ট করতে চাইছিলাম ? আমি খারাপ করছিলাম ? ছিঃ আমাকে তুমি লম্পট ভাবলে ? বলে যখন দাঁড়ায় ততক্ষণে হুঁশ ফিরে আসা নওশীনের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যেতে শুরু করেছে, বোধবুদ্ধি হারিয়ে সে যখন বুঝাতে চাইছে সুদীপ্তকে... বিশ্বাস করো আমি সেটা মিন করি নি.... তখন গনগনে মুখের ওপর জ্যোৎস্নাপড়া আলোতেও নীলচে উঠা মুখের ঝাঁকড়া চুলের সুদীপ্ত'র ছায়া নওশীনের সামনে থেকে সরে গেছে।

১২

হলুদ রোদ সরে যেতে থাকা আলোয় মুনিয়ার চুলকেও ময়ূরাঙ লাগছে... বিকেল বাতাসে উড়ছে... আব্বু আমি নীলটুনির ভাঙা বাড়িটা বানাতে পারছি না কেন ? শফিউল হাসে, তুমি এই ভাঙা ডালটার পেছনেই লেগেছ কেন ? আরও কত ডাল তো আছে।

এটা ওদের খুব প্রিয় জায়গা... দেখছ না ওরা কেমন এই ডালটার পাশে ঘুরাঘুরি করে ?

আমি তোমাকে হেল্প করলে নেবে ?

সচকিত হয় নওশীন মৌটুসিও, আজ মুনিয়ার এই ছোট আবেগের প্রতি শফিউলের মনোযোগ দেখে। মুনিয়া লাফিয়ে উঠে... আব্বু তুমি হেল্প করবে ? দারুণ। দেখবে এরপর পাখিগুলো তোমাকে আর ভয় পাবে না, তোমার বন্ধু হবে।

ফোন আসে শফিউলের... নওশীন নিজের খেয়ালে উড়ছে। শফিউল সন্তর্পণ কণ্ঠে বলে, আমি কি মানুষ না ? আমার ওপর ভরসা নেই ? কালই আমি ডাক্তার চেঞ্জ করব... কাজের মেয়েটাকে যেভাবে পার রাখ, একদম একা থাকবে না... বাকিটা কাল আমি আসছিই তো.. তুমি বুঝছ না কেন, বলতে বলতে চোখ যায় ওর দিকে তাকিয়ে স্থবির হয়ে যাওয়া নওশীনের দিকে একটু ঢোক গিলে সে ফের দম নিয়ে বলে, ছেলেমানুষি করো না ফুফু... আমার চাচাদের তো তুমি জানোই, ফুফা বাড়ি থেকে আসা পর্যন্ত একটু অপেক্ষা করো।

নওশীনের ফের ভয় শুরু হয়, পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাওয়ার ভয়, মুনিয়া মৌটুসিকে ফেলে যদি ঘর বাঁধে শফিউল হরিণীয়ার সাথে ? কোন অতলে ডুববে সে জানে না ? হরিণীয়া এখন ঢাকায় ? অসুস্থ ? না এ ব্যাপারটা নিয়ে সে আর ভাববেও না, নাক গলাবেও না। বড় ক্লান্ত লাগে। কুসুম প্লেট কাপ সরাতে সরাতে বলে, রাইতের লাইগ্যা কী আয়োজন করব ?

মাথায় সেট করাই ছিল নওশীনের, আচমকা এসে পড়া, ধোঁয়া সরিয়ে মুরগি আর চিংড়ি ভেজাও... মৌটুসি মুনিয়ার হয়ে যাবে, টমেটো, বেগুন সেদ্ধ বসাও... ভর্তা করব.. দুটো আলাদা... ভুল হয় না যেন... আর আইর মাছ... কী, দোপেয়াজো করব ? তাকায় শফিউলের দিকে।

করো... বলতে বলতে দু'মেয়ের উচ্ছ্বাসের সাথে কাঠফুলগাছটার দিকে এগিয়ে গিয়ে যেন পালিয়ে বাঁচে শফিউল।

১৩

হেই আমি কে ?

আমি... আ... মি কোকিল—

আরে কী করে হলো ? ওরকম কী কণ্ঠ তোমার ?

না।

তুমি কাকের বাড়িতে ডিম পেড়ে পালিয়ে যাও ?

ওমম না।

তবে ?

বুঝবে না... বুঝবে না এই লবণগঙ্গায় ভেসে যাওয়া... আকাশ হাতড়ানো... ভ্রান্ত অথবা ভ্রান্তহীনতা... এই ভাবনা আগে প্রায়ই বিবশ করত নওশীনকে... আজ আচমকা থুকথুরি বুড়ি শীতের মতো এ ভাবনা উড়ে আসতে থাকলে কুসুমের কেটে রাখা কাঁঠাল বিচি আর কচুর লতি দিয়ে নোনা ইলিশ কষাতে কষাতে বলে সরষে বাটতে... এই অসহ্য জৈষ্ঠের গরমের সিজনে তরও চেয়ে গরম দামে একটা মাঝারি সাইজের ইলিশ এনেছে শফিউল অনেক শখে। ওটা কষাতে থাকা অবস্থায়ই রান্নার আয়োজন করতেই সালেকার ফোন।

অঝোরে কাঁদছে বেচারি। গ্যাসের সুইচ বন্ধ করে বৃত্তান্ত শুনতে থাকে নওশীন, তার মেয়ে ফেসবুকে এ্যাদ্দিন একজন যুবকের সাথে দিব্যি প্রেম চালিয়ে যাচ্ছিল। ফেসবুকে দেওয়া ছেলেটি দেখতেও সুন্দর। দুমাস পর সম্পর্কের এক পর্যায়ে প্রকাশ পায় ব্যাটা দুটো জোয়ান সন্তানের বাবা। ওই ছবি তার নয়। সালেকার কষ্ট একটাই, এখন ওই ব্যাটাকেই না পেলে আত্মহত্যার ধমকি দিচ্ছে তার মেয়ে।

নওশীনের বুক শিরশির করে, কিছু আগে সে মৌটুসিকেও চ্যাটিংয়ে ব্যস্ত দেখে এসেছে। না, নওশীন কখনো কন্যার প্রাইভেসির সামনে গিয়ে নিজের ব্যক্তিত্ব লজ্জা হারানোর সুযোগ দেয় না। অবিশ্বাস ভেতরে কাঁপলেও প্রকাশ করে না। শফিউল আজ পাঁচতারায় মিটিংয়ে বসেছে। সারা জীবনই তার এক প্রবণতা, বাড়ি ফিরে নওশীনকে ফোন বা অন্য কাজে ব্যস্ত দেখলে তার গোড়া থেকেই মেজাজ খিচরে যায়। ফলে এই ব্যাপারটাতে বরাবরই সতর্ক থাকে নওশীন। কিন্তু আজ সালেকার এই ক্রন্দনময় মুহূর্তে আচমকা পাঁচতারা থেকে মদ্যপানরত স্বামীর প্রবেশের পরও কী এক দুর্মর মানসিকতায় কিছুতেই সে ফোনটা রাখতে পারছিল না।

ঘরে ঢুকে মুহূর্তে ওকে দেখে শফিউল। কিছুক্ষণ স্থির দাঁড়িয়ে কাপড় চেঞ্জ করতে গিয়েই ফোঁড়নটা কাটে, কোন লাংঙের সাথে এত মজে আছিস, স্বামীকে চক্ষেই পড়ছে না?

মুহূর্তে কেঁপে উঠে সে... শফিউলের কথা যাতে সালেকার কানে না যায় সেজন্য... চিৎকার করে হ্যালো হ্যালো বলে টেলিফোনের তার ছুটিয়ে দেয়।

এ্যাদ্দিনের দাম্পত্যে একটা সময় এসব সয়ে গেলেও এ নিয়ে বাক-বিতণ্ডা প্রতিবাদ হওয়ার পর যতটা সম্ভব অশান্তি থেকে এড়ানোর জন্য নিজেকে বদলে শান্তির ছাঁচে ঢালার পর আজ আচমকা... যেহেতু শফিউল ঘরে আসার শব্দ পেলে সব গুটিয়ে কিছুক্ষণ হাত-পা ঝাড়া হয়ে থাকে নওশীন, ফলে অনেকদিন এইসব অবস্থার মুখোমুখি হতে হয় নি। আজ একদিকে সালেকার ক্রন্দন ধ্বনি অন্যদিকে শফিউলের এই বাক্যে কিছুক্ষণ বাকহারা হলেও মুহূর্তে শরীরে আগুন ধরে যায় নওশীনের, ঠোঁটে আগুন গিলে বলে, কী বললে?

কেন? কানে ঠসা নাকি? শুনতে পাস নি?

সালেকার সাথে কথা বলছিলাম... তুমি...?

সালেকার সাথে? ফিসফিস করে? আমাকে বোদাই ভেবেছিস?

দাবাগ্নি তক্ষুনি ছুটে... তুই চেক কর, কার ফোন এসেছিল, নিজেকে ধাবিত করে নওশীন, সবাইকে নিজের মতো লুচ্চা ভাবিস, না? বাইরে গিয়ে মদ খেলেই তোর মুখ থেকে এসব গু-মুত বেরিয়ে আসে কেন?

মনে হচ্ছিল মিটিং থেকেই খিচরানো মেজাজ নিয়ে ফিরেছে, যার ঝাড় বউয়ের ওপর ঝাড়ার মোক্ষম সুযোগটা হাতছাড়া করতে চায় নি... কী কী বললি? শফিউলের রক্তচক্ষু বেরিয়ে আসে আর পুরাতন সনাতনী ভঙ্গিতে ওর লাথি চড়ময় অবয়ব সামনে এলে ছিটকে সরে নওশীন দেখে, মেয়েরা পাশের ঘরে আছে, ওরা এখন আর এসব সইতে পারে না। কিন্তু এসব গ্রাহ্য করে শফিউলের অবস্থা কই? চিল্লিয়ে যায় নিজের খানকিপনা অন্যের ওপর চাপাবি না। বিয়ের বেশকিছু পর মদ ধরার পর মারধর গালিগালাজের অভ্যাস হয়েছিল। মৌটুসির জন্মের পর মেজাজি হয়ে বড় হতে থাকলে ওর ভয়ে নিজেকে বদলেছিল শফিউল। আজ এ্যাদ্দিন পর পশুর মতো মারতে ধাবিত হয়েছে? গা জ্বলে যায় নওশীনের, হরিণীয়াকে ইঙ্গিত করে—ওই বুড়িটার কাছ থেকে এসেছিস না? ওই চামড়া ঝুলা বুড়িতেই যদি তোর এত মৌজ, তো ঘরে আসিস কেন? বদমাস বেটি আমার জীবনটা...।

চুতমারানি খানকি মাগি, তর চরিত্র আমি জানি না, ইস্কুলের নাম করে তুই কাল সন্ধ্যায় তুই আবার রূপমনবিবি আর তার জোয়ান পোলার কাছে গেছিলি না? আমি কতবার মানা করেছি ওই বাড়ি যাবি না, ওই পোলা তোর ভাতার? তারপরও ভাতারের বাড়ি গেছিলি? ভাতারের সাথেও লাগিয়েছিস.. ওর মা'র কাছ থেকেও আমার সর্বনাশ করার জন্য আবার তাবিজ-কবজ আনছিস... নষ্টা... কী আমাকে উল্টা চক্ষু দেখাস... তোর মায়েরে আমি চুদি...।

ততক্ষণে দরজায় হতভম্ব মুনিয়া দাঁড়ানো।

আর মৌটুসির অসহ্য চিৎকার ধ্বনিই নাকি... 'তর মায়েরে'... এই একটি বাক্য, যা ঘৃণায় বিষাক্ত বোধে দিশাহীন করে ফেলে নওশীন, জানে না... সে ছুটে অন্য ঘরে গিয়ে ছিটকিনি আটকে দেয়।

হ্যাঁ, গিয়েছিল কাল সে ইসমাইলের মা ওই জ্বিন প্রেতে বিশ্বাসী বৃদ্ধার বাড়িতে। রূপমনবিবি ওর নাম। সেই বৃষ্টিভেজা দিনের পর ওদের জীবনের ওপর অনেক উত্তাল-পাতালের বাতাস গেছে। একটি নিঃসঙ্গ সময়ে যখন সে মুনিয়াকে নিয়ে বিভ্রান্তির চিৎসাঁতার ডুব সাঁতারে ঢেউ খাচ্ছিল বৃদ্ধার কুসংস্কারাচ্ছন্ন আক্রান্ত বিশ্বাসের তীব্র আশ্বাসে নওশীন দিনরাত ন্যুব্জ হয়ে থাকত। সুদীপ্ত'র ছায়া এসে মাথা আচ্ছন্ন করলে, শফিউল হরিণীয়ার ছায়ার দিকে ছুটতে থাকলে কূলকিনারা হারিয়ে আনত সে তাবিজ, পানি পড়া, ঘুমন্ত শফিউলের হাতে পরাত। মুনিয়া তো তখন আগাগোড়া তাবিজ কবজে ঠাসা। বৃদ্ধার প্রতারণা ছিল না। জ্বিন আত্মার সাথে তার মধ্যে থাকত শতসহস্র খাবনামার অর্থ। ধীরে ধীরে ছল না পেয়ে কুসংস্কার থেকে নিজেকে বের করে এনেছে নওশীন, এর মাঝেই জোয়ান হয়েছে ইসমাইল। ছেলে কোথায় যায় কী করে এই নিয়ে পেরেশান মহিলা মাঝেমধ্যেই আকুতিময় কণ্ঠে স্মরণ করত নওশীনকে। ইতোমধ্যে ইসমাইল মুসলিম জঙ্গীদের সাথে জড়িত হয়ে একবার পুলিশের কাছে ধরা খায়, একসময় তার বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ না পাওয়ায় সে ছাড়াও পায়। ততক্ষণে শফিউলসহ বহু মানুষের কাছে ইসমাইল ডাকাত, ধর্ষক এসব বিশেষণেও বিশেষিত হয়ে গেছে। ছেলে জেলে যাওয়ার পর তার মা আধপাগল হয়ে নওশীনের কাছে আসত। আর মহিলার আকুতির মূল্য দিতে গিয়ে নানারকম লাঞ্ছনার শিকার হয়েছে নওশীন শফিউলের কাছে। শেষে শফিউলের কড়া নির্দেশে সে মহিলার সাথে সব যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়। একদিন মহিলা তার গেটে এসে মাথা ঠুকতে থাকলে তাকে টেনে-হিঁচড়ে শফিউল বিদায় করলে আর কোনোদিন মহিলা যোগাযোগ করে নি। কিন্তু যতবার এই পরিবারটির সাথে এই মহিলার সাথে এই আচরণের কথা মনে হয়েছে নওশীনের ততবারই এক অসহায় নিষ্ঠুর যাতনায় তার শূন্য বুক ভেসে ভেসে গেছে। শফিউলের শেষ কড়া নির্দেশের আগে মাঝে মধ্যে যখনই নওশীন তার বাড়িতে যেত, ইসমাইলকে জড়িয়ে অশ্রাব্য কথায় চরাঞ্চল ভাসাত সে।

মুনিয়া বুঝ-অবুঝ চোখে তাকাত নওশীনের দিকে, তুমি কেন আব্বুর কথা মান না? কেন মা'র খাও, বকা খাও? আব্বু আমাকে বলেছে ওই মহিলা ডাইনি বুড়ি... আম্মু তোমার ভয় করে না? আমার ভয় করে, ওই বুড়ি একদিন আমাকে গলা টিপে মারবে। কাল ফোন এসেছিল, অঝোরে কাঁদছিল ইসমাইল, মা বোধহয় বাঁচবে না... শেষবারের মতো আপনারে ক্যান যে বারবার দেখতে চাইছে আমি জানি না।

স্কুল থেকে ফেরার পথে অনেক ভয়ে অনেক সাবধানে গিয়েছিল সে। কিন্তু এসব কথা কে জানাল শফিউলকে! আশ্চর্য মানুষের স্বভাব... এই রাজধানীতেও একজন মরলে আরেকজন খবরই পায় না, আর এমন খবর...। আর শফিউল? সত্যিটা বললে যেতে দিত?

আর কার কাছে কী শুনে শফিউল দাম্পত্যজীবনের এতদিন পরও...?

না, এই বাক্য হাজার ক্রোধের মুখেও কোনোদিন সহ্য হয় নি নওশীনের। মাঝে মধ্যে বুঝিয়েছে অবশ্য নিজেকে, এ ক্রোধের প্রকাশে নওশীনকে বিদ্ধ করার একটি শক্তিশালী বান শফিউলের। আজ আর এই বাক্যকে এই ধাঁচে ফেলে মুক্তি পাওয়ার কোনো ফোঁকড়ই পায় না

নওশীন। তা হলে শিক্ষা কী ? সভ্যতা কী ? শফিউল ক্রোধবশত হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে সবার সামনে যদি কাপড় খুলে উলঙ্গ হতো, তবে তাকে ক্রোধের সময় মানসিক ভারসাম্যহীন আখ্যা দেওয়া যেত, তো ক্রোধের সে এই গালি আর কাউকে দেয় না কেন ? তার থাপ্পড়, লাথি তার গায়ে পড়ে না কেন ? আমি কেন পায়ের নিচে এমন কোন শক্ত মাটির মানসিকতা পর্যন্ত অর্জন করতে পারি নি ভালোবাসা প্রেমহীন দাম্পত্যে শুধু ও চলে গেলে সন্তান নিয়ে কই দাঁড়াব এই ভয়ে অস্থির থেকেছি ? মৌটুসি না হলো সুস্থ, ওর বাবা ওর ব্যাপারটা দেখবে কিন্তু আমি মুনিয়াকে এই অবস্থায় কোন ডালার নিচে লুকিয়ে কোথায় গিয়ে দাঁড়াই ?

কাঁদতে কাঁদতে ক্রমশ ঝিমুনি আসে... দেহমন নিথর হয়ে আসতে থাকে।

মনে পড়ে সুমাইয়ার কথা, ফিসফিস কেঁদে বলেছিল, আসলে বাবা-মা'র অমতে তাকে বিয়ে করেছি, দুজনের মধ্যে কিছু নিয়ে বাঁধলেই তোমার মামা আমার ওই দুর্বল জায়গাটায় ঘা দিয়ে কথা বলত, ওর ক্রোধ খুব খারাপ, আমার যার সাথে এখন বিয়ে হয়েছে ও আমার প্রতি অনুরাগী ছিল আমি না, একদিন সেই ছেলেটি যখন করাচি থেকে এসেছে, জেলাসিতে দিশেহারা হয়ে সেই ছেলের সাথে আমার অশ্রাব্য সম্পর্কের উল্লেখ করায় আমি অস্থির হয়ে ওর বুকে কিল মারতে থাকলাম... এরপর সে ক্ষেপে আমাকে চড় মারতে মারতে বলল, তোর বাবা-মা কোন চরিত্রের জানি না, ওরা আমাকে জামাই মানবে না, এই যোগ্যতা তারা কোত্থেকে পায়! তোর বাবা একটা দালাল, তোর মা একজন মাগি... ঈর্ষা তাকে অন্ধ করার আগে বাবা-মা'র বাড়ি সম্পর্কে সব পুরুষের মতো টুকটাক খোঁচা দিত... সেদিন ঈর্ষায় সে টু মার্চ করেছিল।

কিন্তু ও আমার ক্রোধ জানত না। আমি ওর ওই একদিনের ওই অসভ্য কথায় এরকম সিদ্ধান্ত নিতে পারি, ও কল্পনা করে নি।

আপনি এখনো মামাকে ভালোবাসেন ?

অস্ফুটে ফোপাচ্ছিল সুমাইয়া, আসলে ওইদিন কিছু একটা ভর করেছিল ওর ওপর, জেলাসি ওকে পাগল করে দিয়েছিল। জীবনের এত বড় একটা সিদ্ধান্ত ওর ওই একদিনের আচরণের কারণে নেওয়াটা ঠিক হলো কি না ভাবলে পাগল পাগল লাগে। সব সহ্য হয় নওশীন, যত রাগই হোক কিছু না বুঝে আমার মা-কে নিয়ে... ছিঃ। এছাড়া মানুষটা ভালো। ওর কেয়ারিং তুমি কল্পনা করতে পারবে না। ভালোবাসার সাথে সাথে এমন এক চোখ ছিল ওর, যেন আমাকে নয়, স্বর্গের অপ্সরাকে দেখছে। এসব ভাবলে প্রায়ই কান্না পায়। মনে হয় একদিনের ঘেন্না, সিদ্ধান্তটা কি ঠিক নিলাম ?

হ্যাঁ, ঠিকই নিয়েছেন সুমাইয়া, নিথর রাতে একাকী শয্যায় ফের গুমড় কান্না ওঠে, যে এই ব্যবহার একবার করতে পারে, এমন কথা একবার বলতে পারে, একবার হাত তুলতে পারে, সে সারা জীবন আপনার জীবনের তিলকে রসে-কষে তাল বানিয়ে চিপসাতো। আর মাঝে যদি আপনাদের বাচ্চা এসে যেত, যদিও এই সমাজে জীবনে অপরিসীম অধিকার আর দায়িত্ব একজন বাবার, কিন্তু তার অত্যাচার, লাম্পট্যে স্বেচ্ছাচারিতায় জাস্ট সন্তানের জন্য, তার পিতৃ অবস্থান বহাল রাখার জন্য, সমস্ত নিপীড়ন ত্যাগ এমন কি মৃত্যু... সব সইতে হয় মা'কেই। এই সত্য আমার চেয়ে আর কে বেশি জানে ?

এই মুহূর্তে পৃথিবীর যাবতীয় পুরুষের মুখকে ঘৃণিত লাগতে থাকে নওশীনের, বাবার মুখকেও। বাজরিত মোবাইল নিয়ে জবুথবু মুনিয়া আসে নওশীনের সামনে, কার ফোন না দেখেই নিঃশব্দে ভেতরের হেঁচকি চেপে পড়ে থাকে নওশীন... এই গেস্টরুমে আজ নওশীন না, গেস্ট না হোস্ট কেবল চতুর্দিকে মেঘ নীহারিকার তুলোতুলো ফেনা.. যার তলায় লুকাতে চায় নওশীন, উবে যেতে যায়... আচমকা নিজের গালের মধ্যে চক্ষুজল ফোটায় চমকে তাকায় সে, শিশুকবুতরের মতো ভয়ে কাঁপছে মুনিয়া, আম্মু তুমি কেঁদো না... আমার বড্ড ভয় করছে।

আচমকা জোর চেঁচামেচিতে কান সতর্ক হয় নওশীনের, চিৎকার করছে মৌটুসি বাবার বিরুদ্ধে—আজ যেসব গালি তুমি দিলে আম্মুকে, এই একই গালি আমার হাজব্যান্ড দেবে, এটা ফেরত আসবে আমার হাজব্যান্ড আমাকেও বলবে। তোর মা'রে... প্রকৃতির নিরথ আব্বু...।

তুমি অনেক অনেস্ট, তুমি কেন গালি শুনবে ? তোমার আম্মু...।

আম্মু ডিজ-অনেস্ট হলে তাকে ডিভোর্স দাও না কেন ? কেন তোমাদের এই আনহ্যাপিনেসের মধ্যে আমাদের জন্ম দিলে ? আমাকে উত্তর দাও, আমরা কী পাপ করেছি ? অনেস্টলি বলো আমাদের জন্মের সময় তোমাদের ফিজিক্যাল রিলেশান লাগে নি ? আর এইরকম অসভ্য গালিগালাজ ডিজ-অনেস্টির মধ্যেই তোমরা ওই কুত্তার মতো রিলেশান করেছ ?

স্টপ মৌটুসি! শফিউলের চিৎকারে আচমকা পুরো বাড়িটা নড়ে ওঠে। তোমার আম্মু তোমাকে এইসব শিখিয়ে বড় করেছে ?

তুমি স্টপ! দ্বিগুণ স্বরে চেঁচায় মৌটুসি। কী মনে করো তোমরা, আমরা বাচ্চা, আমরা কিছু বুঝি না ? আরও ছোটবেলায়ও সব বুঝতাম... ভয়ে চুপ মেরে থাকতাম, বাড়ির মধ্যে এরকম চললে আই এম প্রমিজ... আমি এই বাড়ি থেকে যেদিকে খুশি চলে যাব।

বাড়িটা অনেকক্ষণ এক অদ্ভুত নীরবতায় ঢাকা পড়ে যায়।

মৌটুসির প্রতিবাদে পরাণে অসীম একটা আরাম হয়। কিন্তু কী যেন এক যন্ত্রণার সমাচ্ছন্ন ভার বুকে এমনভাবে প্রোথিত হয়ে থাকে যার কাছ থেকে কিছুতেই মুক্তি হয় না নওশীনের এবং সেটা ক্রমশ আর সমাচ্ছন্ন থাকে না। এক অস্থির বোধ হয়ে কাঁপাতে থাকে নওশীনকে... মৌটুসির মেজাজ চড়া... নানা কারণে চটজলদি অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে, কিন্তু সে আজ তার বাবার সাথে তাদের জন্ম বিষয়ে এসব কথা এত দ্বিধাহীন স্পষ্টাকারে কীভাবে বলতে পারল ? মৌটুসির সাথে নানা বিষয়ে নওশীন ফ্রি, কিন্তু সেক্সচুয়েল সম্পর্ক নিয়ে সে কোনোদিন নওশীনের সাথেও কথা বলে নি। নওশীনের বলার প্রয়োজন পড়ে নি।

তবে কি মৌটুসি ওদের অজান্তেই নিজের দূর এক জগতে তার সম্পৃক্ততা পাতিয়ে ফেলেছে যেখানে এসব বিষয়ে কথোপকথন অনেক অকপট ? তার কি এই একই বিস্ময় স্তব্ধতায় তার বাবা টাসকি মেরে গেছে ?

প্রচণ্ড ভয়ের শীতলতা শিরদাড়ায় বইতে থাকলে আকুলভাবে জড়িয়ে ধরে যুবতী শিশু মুনিয়াকে। ওর উত্তাপে শান্ত হতে হতে এই বাস্তবতার ডর থেকে পালাতে দৌড় দেয় শৈশবে।

দিয়েছিল বই সুমাইয়ার হাজব্যান্ড, স্কুল ফেরত পথে... রামায়ণ মহাভারত... নওশীনের ওই বয়সের মাথাটা আউলা-ঝাউলা করতে।

যদিও নওশীনের ভেতরে তখন বিস্ময়ের প্রলয়, বাবা ওদের বিয়ে দিয়েছেন ? যে বাবা সংসারের প্রতি উদাসীন হলেও সবার প্রতি মায়াশীল... মামার সাথে ঘনিষ্ঠতা তো তার আরও বেশি। এই সূত্রেই তিনি প্রায়ই মামার বাসায় যেতেন, তাকে সুমাইয়ার বেদনা এত স্পর্শ করল যে তিনি 'সম্পর্ক' ভুলে গিয়ে নিরপেক্ষ হয়ে গেলেন ? এক কাঁধে স্কুল ব্যাগ আরেক বগলে বই মায়ার ওপর চিতল হরিণের পিঠের মতো কড়ইগাছের পাতা...নিজের বিলোড়ন ঝেড়ে জিজ্ঞেস করেছিল ঘাড়

ঘুরিয়ে নওশীন... আপনার নাম কী ?

লালন।

১৪

এরপরই সুদীপ্তর আগমন... রাত অভিসারের পর নানা ধাক্কায় নিজেকে ছিটকে ঘরের মধ্যে ফেলে শুনত মা'র চিৎকার অথবা ফিসফিস সর্বস্য হাহাকার, কী কইরা আমি মাইয়াগুলোরে বিয়া দিমু... একটু যদি ওর বাবা বুঝত! বড়পা তখন নিজ পড়াশোনা আর টিউশনি নিয়ে এক ঠায়ে অনড়। সে এই আপোষ-টোপোষ করে কারও ঘাড়ে পড়তে রাজি না। এজন্য তাকে আজীবন অবিবাহিত থাকতে হলে হবে। মা সেজপা'র জন্য ভিখিরির মতো দ্বারে দ্বারে পাত্র খোঁজেন। যখন সেখানে যান... দ্রব্যমূল্য লাউকুমড়ার ব্যাপারই হোক, কারও সন্তানের সাফল্যে হাসিহাসি মুখেই হোক ঘুরে ফিরে এক প্রসঙ্গে আসত—বড়টার আশা বাদ, আমার সেজ মেয়েটার জন্য একটা পাত্র... ছেলে পুলিশ হোক কেরানি হোক... আমার মেয়ের যা গুণ... ওর জন্যই সংসারটা সুন্দরভাবে খাড়ায়া আছে... নইলে যেমুন বাউল বাউল ওর বাপ...।

গায়ের রঙটা উজ্জ্বল থাকায় সেজপার কপাল খুলল। পাড়ার এক বাড়িতে দুবাই থেকে তাদের দুসম্পর্কের এক আত্মীয় এল। আসার কিছুদিন পর সেজপা'র দিকে তাকাতেই... সেজপা'র টোপ গেলা হয়ে গেল তার।

এরপর মহাজ্বালা... মা সারাদিন ঘরে ইনিয়ে-বিনিয়ে হাঁটে, পেছন পেছন নওশীন... চুলোর ফরফরানি হাঁড়িতে ভেজা লাকড়িতে ফুঁ দিতে দিতে ফের মা কাঁদে, ক্লাস এইটের নওশীনকে বলে সে—তুই কী সব বন্ধু মিতালী করে বেড়াস আমি জানি না ? ওর মইধ্যে থাইক্যাই দেখ না যদি কুন ভালো ছেলে পাস... আমারে দেখাইবি... গরিব হইতে পারি, আমাদের বংশের একটা ইজ্জত আছে না ? আমি সবাইরে দেখায়া দিমু... তোমরার পোলাদের চাইতে আমার মাইয়ারা সেরা... এসব যত শোনে তত অশরীরী ভয়ে আর অসহায়ত্বে কচ্ছপের মতো গুটাতে থাকে নওশীন। ওকে এই দুরবস্থা থেকে বাঁচায় বাবা, এক মেয়ের বিয়ে দিয়া দেখি তোমার লাই বাড়ছে বড়ো, এই বয়সে আমার বৃত্তি পাওয়া মেয়েটার পেছনে লাগছ ? এইভাবে ছেলে ধইরা ইজ্জত পাওন যায় ?

এরপর বাবা-মা'র কাটাকাটি মারামারি হলে শেষে নওশীনের অসহায় মুখের দিকে তাকিয়ে বাবা সশব্দে ঘোষণা দেন, ঠিক আছে, নওশীনরে আমি বিয়া দিমু... বাবার এই দাপট শব্দে দেড় বছরের জন্য বিয়ের টেনশান থেকে বেঁচে গিয়েছিল নওশীন। এর মধ্যেই লুকিয়ে চুরিয়ে ফের নওশীনের টানে ওর জীবনে ফিরে আসা সুদীপ্তর সাথে দেখা এবং প্রেম বিষয়ে একটি অমীমাংসিত সিদ্ধান্ত আর বুকে ক্ষরণ নিয়ে ঘরে ফেরা। ইতোমধ্যে মেসে থাকা শফিউল নওশীনদের পরিবারের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে—পড়শিদের বদনামকে তোয়াক্কা না করে অবশ্য অনেক আগে থেকেই শফিউলের মেস ঠিকানা ব্যবহারের সূত্র ধরেই পত্র মিতালীর সুযোগ। সেভেনে থাকতে এর সাথে যুক্ত ছিল মেজপা। সে ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন দেখে অচেনা মানুষের সাথে অচেনা নামে পত্র বন্ধুত্ব করত। আর নওশীন বিভিন্ন মফস্বল থেকে বেরোনো লিটল ম্যাগাজিনে লেখা আহ্বানের সূত্র ধরে সেইসব সম্পাদকদের সাথে নানারকম সাহিত্যবিষয়ক আলোচনার মধুরতায় বন্ধুত্বের এমন অনাবিল মজারু নেশায় পড়েছিল... ভোরে দুবোন দাঁড়িয়ে থাকত ডাকপিওনের আশায়... গলির ওই মোড়টার মাথায় পানখেকো টেকো মাথার লোকটার ছিটে পর্যন্ত দেখা গেলে দেহ-মনে অদ্ভুত এক শিহরণ উঠত... সেই জীবনে সেই ডাকপিওন ছিল ওদের সূর্যদয়... ওদের হিরো। চিঠি না থাকলে দূর থেকেই লোকটা টাটার ভঙ্গিতে 'না' করে জানাত আজ কোনো চিঠি নেই। পুরো দিনটাই যেত চুপসে। কিন্তু মেজপা'র বিয়ের পর ওর এই চিঠির সূত্র ধরে বিভিন্ন মফস্বল থেকে নানারকম সাহিত্য বিষয়ক বই আর কাগজের মাঝে একদিন শায়েদের লিটিলম্যাগ এলো। তখন ইন্টারমিডিয়েটে পড়ে শায়েদ। নওশীন গল্প পাঠালে তার চুলচেরা বিশ্লেষণ করে যে মুগ্ধতা প্রকাশ করেছিল শায়েদ, সেটা ছিল তখন নওশীনের লেখক জীবনের সেরা প্রাপ্তি। শফিউল তখন অদ্ভুত এক রহস্যেঘেরা মানুষ। পরিবার বিচ্ছিন্ন একদিকে, অন্যদিকে শান্ত স্থিত কিন্তু অদ্ভুত এক কষ্ট বুকে চেপে বেড়ানোটাই তার স্বভাব। সে কখনো প্রবল আকর্ষণ প্রকাশ করত নওশীনের প্রতি, কখনো অজানা কী এক বিরহে নিজের মধ্যে গুম মেরে যেত। সে-ই ছিল শায়েদের চিঠির সবচাইতে দুর্মর মুগ্ধ পাঠক। ইতোমধ্যে নওশীনের সোর্সেই শায়েদ আর শফিউলের মধ্যেও চিঠি যোগাযোগ হতো। একসময় শায়েদ ঢাকায় চলে গেল, আর এম.এ করে চাকরি খোঁজার প্রত্যাশায় শফিউলও পাড়ি জমাল রাজধানীতে। শায়েদের প্রাণবন্ত ডাকে প্রথম তার ফ্ল্যাটেই বেশ অনেকদিন থেকেছিল শফিউল, যদ্দিন না তার চাকরি হয়।

কিন্তু হলে কী হবে...

একসময় সুদীপ্ত জরুরি কারণে এক জায়গায় তাকে দেখা করতে বলার পর কী কারণে বড়পা অজ্ঞান হয়ে গেলে আর যেতে পারে নি নওশীন। এরপর থেকে ফের সুদীপ্ত হাওয়া। নওশীনের মনে অহির্নিশি সুদীপ্তের দহন। মোবাইলহীন টিনএজটিহীন এক মরাটে শহরে একবার সুদীপ্ত হারিয়ে গেলে প্রহর প্রহর তার প্রতীক্ষায় দিন রাতের ক্ষরণ পুড়ন... মাঝে মধ্যে দূর বাতাসের পাহাড়ের ওপারের পাখির মতো... রঙধনুর সাতরঙের মিশেলে এক ফালি রক্তাভ রঙের হাওয়ার মতো চিঠি আসত, "তুমি আমার জীবন জানো না নওশীন... কেন ধর্মবদলের কথা বলো ? যেখানে আমি বলছি মানব ধর্ম ছাড়া আমার কোনো ধর্ম নেই।

আমার জীবনটা অর্জুনের মতো আকাঙ্ক্ষায় রাজার জীবন নয়, আমার বাবার সাথে আমিও আমার বিশাল ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ পরিবারে নিয়তির অবিচারের শিকার। পাণ্ডবদের সহোদর থেকে কর্ণকে তার মা ফেলে দিয়ে অস্বীকার করেছিল কলঙ্কের দায় থেকে বাঁচতে... আমার বাবাকেসহ আমাকেও আমার পরিবার ত্যাগ করেছে। তাদের ত্যাগ নিয়ে তাদের মনঃস্তাপ নেই, আমাদের প্রতিবাদ আমরা চালিয়ে যাব। ফাঁকে সব যুদ্ধ আর হিসেবের বাইরে গিয়ে এই যে তোমার প্রেমে পড়লাম... বাধার পর বাধা, এছাড়াও পরিণতি কী এই সম্পর্কের জানি না, তবে একটা সত্য জানি কিন্তু তোমাকে ছাড়া আমি আমার জীবনটা ভাবতে পারি না" এই শেষ লাইনটাই হাজার হাজার বার পড়ে কাকের মতো রোজ অজানা কোনো গন্তব্যে বাসরত সুদীপ্তর একফোঁটা চিঠির জন্য হাঁ হয়ে থাকতো যত তত লড়ত সংসারের অভাব-অশান্তি-টানাপড়েনের সাথে।

দিন ধরেই মা কোথায় যেত, কী নিয়ে কখনো টেনশন কখনো অস্থির হয়ে হাঁটাহাঁটি করত বোঝা যেত না। এক রাতে হাওয়া নেই শব্দ নেই, নওশীনকে স্তব্ধ করে দিয়ে মা আছারি-বিছারি করে ভেঙে পড়েন, গ্রাম থেকে কোন মাস্টার নাকি নওশীনকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে, প্রচুর ঘর-গৃহস্থালী আছে তাদের এক সুতা যৌতুকও চায় না, মা'র দেয়ালে পিঠ ঠেকেছে, নওশীনকে যে-কোনো মূল্যে এই বিয়েতে মূল্যে রাজি হতেই হবে।

নওশীনের মাথায় আসমান ভেঙে পড়ল।

রাতে অদ্ভুত এক স্বপ্ন দেখল সে... একটি অপার্থিব স্তবক সজ্জিত সমুদ্রের ঢেউ তার ওপর বাতাসে আশ্চর্য ময়ূর পালকঘেরা একটা রথ নামল... অভিভূত

হয় নওশীন... রথের মধ্যে কাঁদছে... আরে মৎস্য চাষীরা চিৎকার করতে থাকে, এর তো জন্মই হয় নি একটি পিণ্ড বাচ্চার মতো কাঁদছে কেন ? আচমকা হাতছানি সুদীপ্তর একে কোলে নাও... এক নারীর পেট দেখতে কাচের মতো, তার মধ্যে একটি ভ্রূণ অঝোরে আমি হারিয়ে যাচ্ছি বলতেই দুঃস্বপ্নের ডানায় ভর করে হারিয়ে যেতে থাকে সুদীপ্ত। নওশীন চিৎকার করে সুদীপ্ত তুমি যেয়ো না.. আমি বাঁচব না...। সমুদ্রের তরঙ্গিত জল থেকে তখন কষ্টের বাঁশি বাজছে... দামামা বাজছে রাম-রাবণের যুদ্ধের সমুদ্র একবার দুভাগ না ক'ভাগ হচ্ছে ঠাহর হয় না... কিন্তু... পতনে পড়ে দেখে বুলবুলিকে... বলে, আমার জন্য কেঁদো না আমি তোমার গর্ভে আবার জন্ম নেব... বলতেই সে হাওয়া... এরপরই কোত্থে কে যেন সুদীপ্তর মুখ শফিউলের মুখের মতো হয়ে যায়... ওরা কী বলে কী করে বোঝার আগেই বাবার ডাকে ঘুম ভেঙে যায়।

দেড় বছর আগের সাহসী বাবা ভঙ্গুর... নিস্তব্ধ বসে আছে। পায়ের কাছে কাঁদছেন... তোর মা যা বলে মেনে নে... আমি হেরে গেছিরে... ঋণে ঋণে আমি জর্জরিত... পাগল মানুষ আমি... চলতে পথে কে কীভাবে আমারে ঠকায়া গেছে আমি কিচ্ছু বুজি নাই। কোনোদিন না। আমি আমার কিচ্ছু তোরে বুঝাতে পারব না... আজ তোর জন্য দোয়া ছাড়া কিচ্ছু নাই আমার।

অথচ কিছুদিন আগেই কলকাতা থেকে চিরকুট এসেছে, আমার জন্য ক'দিন অপেক্ষা করো। আমি সব বুঝে গুটিয়ে চলে আসছি। যখন সে মুহূর্মুহু অপেক্ষার প্রহরে ভাসছে ডুবছে তক্ষনি আচমকা কোন সূত্র ধরে মা'র কাছে আসা এই প্রস্তাব। শফিউল-শায়েদ দুজনকেই জানিয়েছিল নওশীন, সুদীপ্তর এই চিঠির কথা। কিন্তু মা'র এই আচমকা প্রস্তাবের ব্যাপারে সে শায়েদকেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। সুদীপ্তর নাম্বারটা দিয়ে বলে, তার এই অবস্থার কথা সুদীপ্তকে জানাতে। নিরন্তর দারিদ্র্য যুদ্ধের সাথে প্রাণযুদ্ধে কখনো কম্পিত কখনো ক্লান্ত নওশীন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে ... সুদীপ্ত কোথায় তুমি ? আমার পরাণের অশ্রু-রক্ত-ঘাম মিলেমিশে এক হয়ে যাচ্ছে। না আমি আর ভয় পাই না ধর্মকে... উড়ালকে... আমি দিক-বিদিক ছুটছি... আমি ডোবা দিঘি ঘাস মাটি সব চরণে তাচ্ছিল্যে মাড়িয়ে তারই রূপ-গন্ধে বাঁচার প্রাণান্তকর লড়াইয়ে নেমেছি... আমার চারপাশ রুদ্ধ ক্রূর গন্ধ হয়ে আমার কণ্ঠনালি চেপে ধরছে... যেন নাইটিঙ্গেল পাখি হয়ে কাঁধে বসে শায়েদ, তারপর ? এসেছিল সুদীপ্ত ? সুমাইয়া, লালনের কী হলো ?

ওহ্ লালন ? নওশীন কম্পিত, তখন তো ওরা ওদের নিজের বিপন্নতা প্রেম নিয়ে বিভ্রান্ত... আমি কেবল লালনের দেওয়া বইয়ের মধ্যে ডুবে কখনো দিকভ্রান্ত কখনো মোহাচ্ছন্ন কখনো ওদের দাম্পত্যের সুখ-বেদনার দিকচক্রবাল থেকে পলায়নরত, ওদের জীবন দেখার মতো আমার অবস্থাকেই দেখছি। হ্যাঁ, শায়েদ, এসেছিল সুদীপ্ত... নিজের কাজ ফেলে... অসম্পূর্ণ অবস্থায় আমাকে থামাতে, আমার কাছে সময় চাইতে।

তারপর ?

তুমিই তো একমাত্র সাক্ষী শায়েদ... প্রাচীন গ্রামের নিঃসঙ্গ বৃক্ষের মতো... তুমিই তো একমাত্র সব জানো।

কাঁপতে কাঁপতে বিছানার এপাশ থেকে ওপাশে গড়ায় নওশীন। সাহস করে প্রিয় উদ্দাম নদীতে আমাকে নিয়ে বলেছিল—এই নদী আকাশ মানুষের মনকে বড় করে, দ্বিধা মুক্ত করে, তুমি ভেতরের সব ভয় উড়িয়ে দিয়ে স্রোতস্বী নদীর কাছে আমার সাথে চলার, তা যেভাবে যখনই হোক, চলার সাহস চাও। সত্যিই যখন নওশীনের পরানটা ব্যাপক হয়ে উঠল, তখন নদীর একপাশে ধীরে ধীরে ভিড় করছে মানুষ। সুদীপ্ত মাঝিকে বলে কী কায়দা করে যে উল্টোদিকে নৌকা ঘুরিয়ে এসে উঠেছিল তার এক বন্ধুর বাড়িতে, নওশীন নিজেই জানে না। বন্ধু দুজনকে অনেকটা অকপট সময় দিয়ে চলে গেলে সুদীপ্তর বুকে আছড়ে পড়ে নওশীন... আমাকে নিয়ে চল। যেখানে খুশি যেদিকে দুচোখ যায়...

তখন নওশীনের সামনে কলকাতা থেকে স্রেফ নওশীনের জন্য উড়াল দিয়ে আসা মানুষটার বিপন্নতা... বিপর্যস্ততা, ধর্মভেদ সব তুচ্ছ... সে অলৌকিক এক রাজপুত্র তখন আর ঘুটে কুড়ানি নওশীন জীবনের প্রথম তার স্পর্শে অপ্সরা... অস্ফুটে বলতে থাকে সুদীপ্ত, আমি সব কাজ অসম্পূর্ণ ফেলে এসেছি। বাবা চাকরি করে ট্রান্সফার হওয়ায় দল থেকে প্রচুর নেগেটিভ চাপ আসছে তার ওপর, আমি প্রচণ্ড চেষ্টা করছি দাদাকে মানাতে, যেন বাবার ব্যাপারটা বুঝেন, এই অবস্থায় তাকে ফেলে জাস্ট তোমাকে বুঝাতে এসেছি, এই মুহূর্তে প্রেম ভালোবাসা আমার জন্য হাস্যকর, তুচ্ছ... আমি তোমাকে ভালোবাসি, প্রেমে পড়েছি এ মিথ্যা নয়, বাট আমি...। নওশীনের পায়ের নিচ থেকে মাটি নয় পাহাড় ধ্বসতে থাকে। সে অসহায় ডুবন্ত শিশুর মতো আঁকড়ে ধরে সুদীপ্তকে... এভাবে বলো না... আমি কিচ্ছু ভাবতে পারছি না তোমাকে ছাড়া... আমার পৃথিবী অন্ধকার, বলে সে ব্যাগ থেকে কাঁপতে কাঁপতে সিঁদুরের কৌটা বের করে তোমাকে ধর্মান্তরিত হতে হবে না... তুমি আমাকে সিঁদুর পরাও... তারপর যে যুদ্ধে তুমি যাবে, সেই যুদ্ধে আমি তোমার সাথে থাকব, বিশ্বাস করো আমি তোমার জীবনের ভার হব না.. আমি মরে যাব সুদীপ্ত... নওশীনের এই প্রচণ্ড আকুতিময় কম্পনে ধ্বসতে থাকে সুদীপ্তও... সে ক্রমশ জড়াতে থাকে নওশীনের দেহের সাথে... কেন সিঁদুর ? তুমি জানো না হিন্দুর গর্ভ থেকে জন্ম ছাড়া কেউ হিন্দু হতে পারে না... বলতে বলতে কী এক অলৌকিক ঘোরে সিঁদুর পরায় নওশীনকে, আমাকে কিছুদিন সময় দাও নওশীন।

সেই সময়টাই আমার হাতে নেই।

তোমার পরিবারকে বুঝাও নওশীন, বলতে বলতে নওশীনের দেহের মধ্যে বিলীন হয়ে যায় সুদীপ্তের উত্তপ্ত দেহমন।

পরদিন চিরকুট লিখে রীতিমতো বাতাসের সাথে মিশে যেতে থাকে সুদীপ্ত... যদি ভালোবাসো যুদ্ধ করো... অপেক্ষা করো... আমি আমার ঠাকুরদার সাথে হয় শান্তি নয় যুদ্ধ কিছু একটা উদ্যোগ নিয়ে তোমার কাছে আসব।

নওশীনের মন দেহ বৃক্ষের শেকড়সুদ্ধ উপড়াতে থাকে। বাড়ির এই করুণ দশার মধ্যেও দুদিন পরপর নানা, দাদাবাড়ির আত্মীয়রা আসে কত যে কারণে... বেশির ভাগই ডাক্তার দেখাতে। তারা জাতাজাতি করে এই বাড়িতে কোথায় ঘুমায়, কী খায় এর কূলকিনারার নাগাল পায় না নওশীন। গ্রাম থেকে কৃষক দাদা-দাদির চিঠি আসে পুত্রের কাছে, এইবার জমিতে ধান ফলে নাই, অনেক কষ্টে তুমারে লেখাপড়া করাইছি... ট্যাকা পইসা পাঠাও।

আলো-অন্ধকারের গহীন গড্ডলিকায় যত ডুবে নওশীন তত মা'র বেহুশ বেহাল দশায় কষ্টের চেয়ে তীব্র ভয়ে নিজের মধ্যে নিজে খণ্ডবিখণ্ড হতে থাকে নওশীন। মা'র হুমকি কান্না বিভীষিকায় রূপ নেয়, গ্রামের সেই অচেনা অদেখা ছেলেকে বিয়ে না করলে তিনি আত্মাহুতি দেবেন।

মফস্বলের নিথর গলিতে এরপরও ডাকপিওনকে দেখে ফিনকি দিয়ে ওঠা বুক ধরক ছাড়া নওশীন তখন জিন্দালাশ... মা জানে, গ্রামে গিয়ে কৃষাণ বধূ হয়ে হাল চাষ করা জীবনের মাঝে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার মতো ন্যূনতম মানসিকতা, যোগ্যতা আর স্পৃহা তার নেই। মাস্টার মশাই কি বাড়িতে এসে নওশীনকে গ্রামের জীবনের এই আবহের বাইরে একফোঁটাও দূরে কোথাও নিয়ে যেতে পারবে ? এর মধ্যেই এক

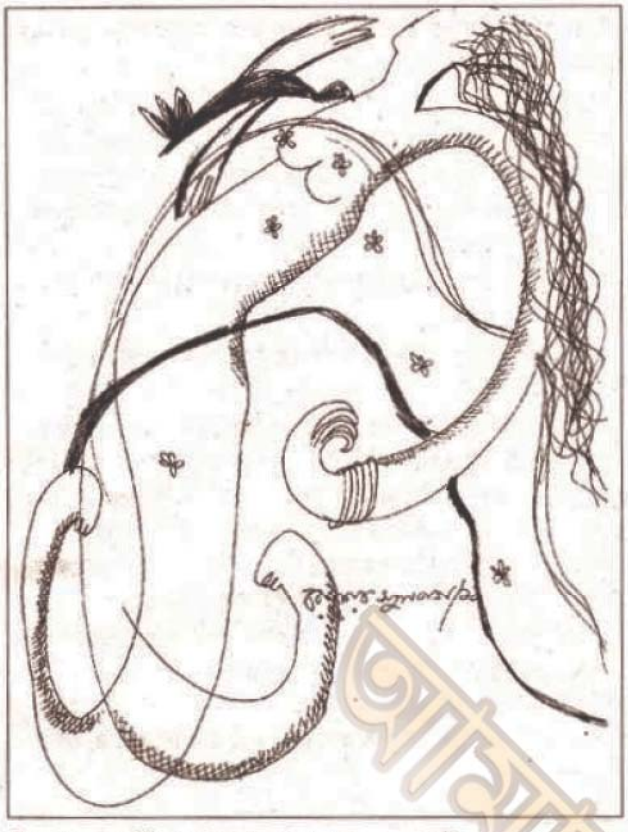

উড়ে যাওয়া শীতে যখন পাতা ঝরছে... কংস কিংবা ব্রহ্মপুত্র নদের স্তিমিত অবস্থায় হালকা কাঁপনের ঢেউ উড়ছে... মরা কাশবন ব্যাকুল হয়ে তাকিয়ে আছে খরখরে ভয়ে আসমানের দিকে... যখন নিথর শীত পেরোলেও যাই যাই বসন্তে বাতাসের উদ্দামতা নেই, পুষ্পের সম্ভারে বসন্ত ভরে উঠছে না, তখন মাস পেরুনো নওশীনের বুক উপচে বমির দহন... সে প্রায় আর্ত চিৎকারে প্রথমেই জানায় শায়েদকে... চিঠি লেখে সুদীপ্তকে, সময়ই নেই আমার কাছে... আমি সম্ভবত...।

শায়েদ কলকাতায় চেষ্টা করে ফোনে, কিন্তু পাওয়া যায় না সুদীপ্তকে।

নওশীনকে কেন্দ্র করে নিজের দুর্বল আবেগ অনুভূতি কেবল শায়েদকেই প্রকাশ করত শফিউল। শায়েদ শফিউলকে নিয়ে ছুটে আসে। নওশীন এখনো স্মরণ করতে পারে না ওই সময়ের ওই কটা দিনের মধ্যে কী করে তার জীবনের আসমান জমিন আমূল বদলে গেল। শায়েদ ফিসফিস করে ধমকায় নওশীনকে, এই ভয় এই আশঙ্কা কাউকে জানাবে না। শফিউল সুদীপ্ত নামের ছায়াকে পর্যন্ত ভয় পায়। তুমি কিচ্ছুর বিনিময়ে ওর প্রতি তোমার দুর্বলতার উফটুকু প্রকাশ করবে না। মৃত্যু, আত্মহনন কোনো সমাধান নয়, নওশীন যে পরিস্থিতিতে সামনে এসে দাঁড়িয়েছ তার মুখোমুখি হও... ভেতরে বিষের বালি মুখ বুজে মুক্তা ফলাও... যে ভয়ে তরপাচ্ছ... সেই ভয়ের উৎস পর্যন্ত ভুলে যাও নওশীন। দোহাই, আমার কথা মানো।

সেই রাতেই শফিউলের সাথে বিয়ে হয়ে যায় নওশীনের।

১৫

মুহূর্তগুলি দিনগুলি কাটতে কাটতে এগোয়। আজব মানুষের মন, তার বিবর্তন বাস্তবতার রঙের নানা রূপের ধরন। হা সময়! শতাব্দীর পর শতাব্দী যাই হোক যে-কোনো কিছুকে স্থিত করতে 'সময়'-এর ভূমিকার কাছে মানুষকে নতজানু হতে হয়।

দুদিনের আগে যে জীবনের মুহূর্ত ছিল শূন্য, তিক্তময়, যে চেহারার রূপ ছিল বীভৎস, দিনের কাজ করতে স্বস্তিকরভাবে বাঁচার জন্য সংসারের জাগতিক কর্মগুলো, যার বেশির ভাগই যুক্ত অর্থের ওপর এ নিয়ে পারস্পরিক হিসেব-নিকেশ বোঝাপড়ার মধ্যেও এক রাতে মুনিয়াকে নিয়ে শফিউলের কঠিন অসহায় দুশ্চিন্তাকর কণ্ঠ নওশীনকে তার ভেতরের যাবতীয় টানাপড়েনকে তুচ্ছ করে তোলে।

আমরা আর কদ্দিন নওশীন ? অবস্থা যাই হোক, বয়স বাড়ছে মুনিয়ার। আমাদের মৃত্যুর পর কে দেখবে ওকে ? কীভাবে বাঁচবে ও ? তুমি ওকে নিয়ে ওভার সেনসেটিভ, এজন্য এ নিয়ে তোমাকে কিছু বলি না। কিন্তু প্রতিদিন এই এক টেনশন আমাকে কী যে অস্থির করে তোলে তোমাকে কী বলব। চোখ ভিজে উঠতে থাকে শফিউলের, ধরো ওর জন্য আলাদা টাকা জমাচ্ছি... ধরে নিচ্ছি মৌটুসিকেই ভাবছি ওই টাকার সাপোর্টে ওকে দেখবে, এটা কি নিজেদেরকে নিজেদের এক ধরনের প্রলোভন দিয়ে ভুলিয়ে রাখা না ? আমরা কী মৌটুসির ভবিষ্যত কী হবে তা এখনই নিজেদের মতো করে একটা কিছু ভেবে তৈরি করে সেই ভাবে ওর জীবনটা বানাতে পারব ? এটা যে কত ভয়ঙ্কর এক বাস্তবতা...

শুনতে শুনতে নিঃশ্বাস আটকে বিস্ময়ভরা চোখে সে যেন শফিউল নয়, বেদনাতুর এক অপার্থিব মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

আজ এতসব এই জন্যই মনে পড়ছে, আমার একজন সিনিয়র কলিগ তার ছেলের জন্য মৌটুসির বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এল। যদিও আমি মানা করেছি ওর পড়া শেষ না করা পর্যন্ত ওর বিয়ে দেব না। কিন্তু এরপর থেকেই জানো নওশীন... কতকাল পর মুনিয়াকে নিয়ে বিপর্যস্ত শফিউলের এইরূপ নওশীন দেখল। একজন মানুষ আরেকজনকে কেন তার একরৈখিক রূপটা দেখেই সেটাকেই নিজের মধ্যে ব্যাপক করে তোলে, বিশেষত সেই রূপ যদি নেগেটিভ হয় সেটাইকেই ? মুনিয়াকে নিয়ে যে শফিউল প্রতিদিন চিন্তা করে অস্থির বোধ করে, নওশীন অস্থির বোধ করবে বলে নিজের মধ্যে গোপন রাখে কেন নওশীন তার ছায়ামাত্র দেখতে পায় না ? যা প্রকাশিত, তাই কেন মোটা দাগে প্রকাশিত হয়ে মোটা মোটা সুখ বা বেদনা দেয় ?

মুনিয়াকে নিয়ে আচম্বিতে এই নিয়ে এক মহাদুশ্চিন্তা আর অন্যদিকে শফিউলের প্রতি প্রগাঢ় মায়ায় ওর সামনে দাঁড়ায়। ওর মাথাটাকে নিজের বুকের মধ্যে নিয়ে ফিসফিস কান্নায় বলে, তুমি এসব নিয়ে ভেবো না। তোমার ব্লাডপ্রেসার এমনিতেই এত হাই থাকে, এসব ভেবে নিজেকে অসুস্থ করো না। এই একটা ব্যাপার আমরা সময় আর আল্লাহর হাতে ছেড়ে দিই ? প্লিজ শফিউল প্রমিজ করো, আমার যত খারাপই লাগুক যদি তুমি তোমার রাগ আমার সামনে লুকাতে না পারো, পেরো না তো টেনশান লুকিয়ো না।

দুজন পারস্পরিকভাবে যুক্ত একই হৃদবেদনায় ক্রমশ তারা ভুলে যেতে থাকে তাদের ব্যক্তিগত ক্ষরণ আনন্দ সব।

নবনীতার ফোন আসে, জানায় দুদিন পর তাদের বিয়ে বার্ষিকীতে অবশ্য অবশ্যই যেন নওশীনরা যায়। এই অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে পয়লা অধিকার নাকি নওশীনদেরই। এ ব্যাপারে শায়েদকে যেন নওশীন কিছু না বলে, আগে থেকে হুজ্জোতের ঘ্রাণ পেলে শায়েদ গুটিয়ে যেতে পারে।

পয়লা অধিকার হা-নিমজ্জিত ছায়া আলোর পাকে পাকে হেঁটে নওশীন বিছানা গোছায়, ড্রেসিং টেবিলের গ্লাস মুছতে মুছতে ভূতের গলির পাঁচতলায় গিয়ে হাজির হয়। চিকন সরু নানা বাঁকের নানা পথ। ওর মাঝে যে প্রক্রিয়ায় যে অবস্থা আর দুঃসহ বাস্তবতার পীড়ন টেনশনেই

ওর বিয়ে হয়ে থাকুক না কেন এনজিওতে প্রথমদিকে সামান্য বেতনে জয়েনরত চাকরিজীবী শফিউল ওই নিকষ আঁধারের মধ্যে একটি অলৌকিক জিনিস তুলে দিয়েছিল নওশীনের হাতে, আলমিরার চাবি। ঘরে আসবাব বলতে হঠাৎ কেনা আলমারি, একটা খাট আর বাইরের ঘরে বসার জন্য একটা ছোট্ট টেবিল ঘেঁসে ক'টা চেয়ার ছিল। সংসারের ভার কাঁধে নিয়ে নওশীনের মতো খুশি আর কেউ হয়েছিল কি না জানা নেই। একটা টাকা মা-বাবার কাছে চাইতেই যখন দশটা চিন্তার পল্টি খেতে হতো, তখন ওর হাতে তুলে দেওয়া শফিউলের বেতন, তা যত সামান্যই হোক হিসেব করে তিল তিল খরচের মধ্যে এক ব্যাপক আনন্দ ছিল। অল্প অল্প করে হাঁড়িবাসন চুলো থেকে শুরু করে ঘর নিজ হাতে মেপেজোকে কেনার মজাই ছিল। দেয়ালে সেট করা বেত ফ্রেমে বাঁধানো আয়নাটা এর মাঝে সবচেয়ে অলৌকিক ছিল। নওশীনের জীবনে ওই হুলোস্থূল বিয়ে স্রোত জীবন, বাস্তবতা, স্বপ্ন, প্রেম সম্পর্কে এমন বোধ দিয়েছিল স্রেফ ভাগ্যের ওপর নিজেকে ছেড়ে দিয়ে ওই বাড়িতে পা রাখার আগেই জীবনটা হয় ভেসে গেল, নয় ভাসিয়ে দিল নওশীন। ওই কয়েকটা দিনে টেনশনে অস্থিরতায় জীবনের মস্ত ভারে নওশীনের দেহটা টুনটুনির মতো হয়ে উঠেছিল। বিদায় মুহূর্ত মাথা থেকে নামা দুর্বিষহ চাপমুক্ত মা'র হাসিটাকেই মুঠোর মধ্যে সম্বল করে শফিউলকে তার মধ্যে রীতিমতো ওই অবস্থায় আসমান থেকে উড়ে আসা দেবতা করে তুলেছিল।

অজানা অপরিচিত একজন লোকের হাত ধরে গ্রামে গেরস্থালীর জীবনের চাইতে সহস্র গুণ ভালো তার অতি চেনা নিকটজন, যে তার জীবনের সমস্ত সত্য-মিথ্যা জানে তার সাথে এসে রাজধানীতে সংসার পাতাটা রীতিমতো পরম ভাগ্যের। ওই অবস্থায় দু'রুমের পাঁচতলা বাদ দিয়ে যদি শফিউল তাকে একটা বস্তিতে নিয়েও উঠত তাতেও ধন্যবোধ করত নওশীন।

শফিউল জীবনের এক ভীষণ আঁধার চক্র থেকে তাকে উদ্ধার করে রীতিমতো নতুন এক জীবন দিয়েছিল নওশীনকে।

নিখুঁত হাতে ঘর পরিপাটি করা, দুজনের জন্য অল্প খরচে মাছ সবজি গুনে গুনে কয়েক পদ তৈরি করে একসাথে খাওয়া সেই তার পরিচিত পাড়াতে শফিউলের সাথে অনাবিলতার সঙ্গে কথা আড্ডা আরেক রূপ শফিউলের সে এখন নওশীনের হাজব্যান্ড... কেমন জানি অদ্ভুত আর লজ্জাবনত বোধ দিত নওশীনকে।

তুমি আমাকে এত ভালোবাসতে, প্রকাশ করো নি কেন ?

তুমি আমাকে বাসতে না... তুমি সুদীপ্তকে ভালোবাসতে, কেমন যেন কঠিন আর দৃঢ় হয়ে উঠত শফিউলের কণ্ঠ।

তাহলে হুট করে এসে বিয়ে করতে চাইলে যে ? আমার দুর্দশা দেখে আমাকে করুণা করার জন্য ?

করুণা করতে চাইলে অনেক পথ আছে, কোনো বোকাও অন্তত করুণা করে নিজের সারা জীবনের দাম্পত্যের সাথে আরেকজনকে জড়াবে না। ক্রমশ নরম হতে শুরু করে শফিউলের কণ্ঠ, আমি আগে থেকেই তোমাকে পছন্দ করতাম, মনে মনে ভালোবাসতাম। ক্লাস ফাইভ থেকে তোমাকে দেখেছি, তোমার সততা সরলতা সংসারের জন্য ত্যাগ আমাকে অভিভূত করত। যখন দেখলাম সুদীপ্ত তোমার জীবনে নেই, তোমার এমন এক জায়গায় বিয়ে হচ্ছে, যে জায়গাটা তোমার একবিন্দুও প্রত্যাশার নয়, তখন আমি আমার ভালোবাসাকে গুরুত্ব ছিলাম।

শফিউল... অস্ফুটে ওর কলার চেপে কেঁদেছিল নওশীন, তুমি এত কাছে ছিলে, কেন আমি তোমার এই রূপটা দেখতে পাই নি ? প্রমিজ করো, কথা দাও, তুমি কোনোদিন আমাকে ছেড়ে যাবে না।

না... না...। তুমিও প্রমিজ করো, আজ থেকে সারা জীবন সুদীপ্ত নামের ছায়াটাকে পর্যন্ত আমাদের জীবনে তো দূরের কথা তোমার মনের কোনো পর্যন্ত আসতে দেবে না।

না... না...।

ফোন বাজলে সচকিত হয় নওশীন, ফের নবনীতার কণ্ঠ, আমি কাল তোমার বাসায় আসব, মানে তোমার হাতের পুডিং শায়েদের খুব পছন্দ, আমি তোমার কাছ থেকে ওটা শিখে বাকিটা রেসিপি দেখে পুডিংয়ের কেক বানাব। তোমার সমস্যা হবে না তো ?

আরে না না, তো তোমাকে যে ভাই কষ্ট করে সন্ধ্যায় আসতে হবে, দিনে আমার স্কুল আছে।

ও হ্যাঁ, কী ব্যাপার এ্যাদ্দিন পর আবার স্কুলে জয়েন করেছ ? কোন আর্থিক প্রবলেম ?

আরে ? তোমার মতো সচেতন মেয়ে এই প্রশ্ন করে ? হাসে নওশীন, আসলে সংসারটা বিশেষত মুনিয়াকে সামলে আমি কাজটা করতে পারছিলাম না। এখন ও অনেকটাই সুস্থির, অনেক কিছুই বোঝে। শুধু রান্নাবান্না, ঘর গোছানো এসব কাজে খুব ফেডাপ্ লাগছিল। থ্যাংক গড শফিউলকে। আমার অবস্থাটা বুঝাতে পেরেছি। বিয়ের পর ধাক্কা খেয়ে খেয়ে সংসার-সন্তান সামলে রীতিমতো নিজের সাথে নিজে যুদ্ধ করে পড়া শেষ করার পরও যদি জাস্ট বুয়ার কাজই করি।

ও গ্রেট। নবনীতা হাসে, তোমার আর শায়েদের যুক্তির সাথে পারা— অবশ্য আমি নিজেও তো একদিনের জন্যও জবলেসভাবে সংসার করার কথা চিন্তা করতে পারি নি, তো কাল আসছি এবং এটা সিক্রেট ও. কে ?

ও. কে।

ধারাবাহিকতা ছুটে যায় চিন্তাসূত্রের। অনেকদিন পর সে নবনীতার সাথে এত আপন অনাবিলতায় কথা বলল।

শায়েদের সাথে পরিচয়ের সূত্র ধরে নওশীনের বিয়ের পাঁচ বছর পর বাচ্চা নিয়ে এসে ওদের ভূতের গলির বাড়িতেই উঠেছিল নবনীতা।

তখন শায়েদ কোনোমতেই কাউকে বিয়ে করার জন্য প্রস্তুত ছিল না। শায়েদের সাথে পরিচয় সূত্রে নওশীনের সাথে নবনীতার ফোনে কথা হতো। কোনো এক উদ্‌ভ্রান্ত সন্ধ্যায় পুত্রসহ নবনীতা নওশীনের বাড়িতে এসে হাজির। জুয়াড়ি, বহুগামী, গাঁজাখোর স্বামীর অত্যাচারে তালাকের পরও টিকতে পারছিল না নিজ এলাকায়। নিজের সব বিক্রি করে ফতুর স্বামী-সন্তানকে নিজের কাছে পেতে আইনি লড়াইয়ে হেরে গুণ্ডাপাণ্ডা লেলিয়ে দিয়েছে নবনীতার পেছনে। আত্মীয়স্বজন, চাকরি সব ছেড়ে নবীনতা ঢাকায় নওশীনের বাড়িতে এসে ওঠে। এই বাড়িটাই নিরাপদ, আত্মীয়ের বাড়ি হলে ব্যাটা ঠিক ধর্না দিয়ে বের করে ফেলবে।

এর মাঝে খবর আসে কী একটা কুকীর্তি করার পর ব্যাটার তিন বছর জেল হয়েছে। জীবন সংসারের প্রতি তিক্ত নবনীতাকে তখন ছায়ার মতো আগলে গেছে শায়েদ। তখন দু'কন্যা নিয়ে টানাপোড়েনের সংসার নওশীনের। বিয়ের পাঁচ মাসের মধ্যে নওশীনকে হতবাক করে দিয়ে শফিউলের কথিত অনাথ একাকী জীবনের ভুঁইফোঁড়ে তার বাবা-মা এসে হাজির হয়েছিলেন। ক্রমান্বয়ে ম্যারেড-আনম্যারেড মিলিয়ে আরও পাঁচ বোন। তখনো নওশীন বুঝে উঠতে পারে নি কী এমন কষ্টে শফিউলের বাবা-মা সন্তানের সাথে তাদের দূরত্ব ঘটিয়েছিলেন ? আর কাউকে না বলে নওশীনকে একাকী বিয়ে করার পর ক্রোধের বদলে কোন খুশিতে তাদেরকে বরণ করতে এসেছিলেন ? বাড়িতে আত্মীয়দের আসা যাওয়ার মাঝেও শফিউল-নওশীন প্রাণপণ চেষ্টা করে অন্য কোথাও নবীনতাকে সন্তানসহ থাকার জন্য ছোটখাটো একটা ফ্ল্যাট খুঁজে দেওয়ার জন্য। অন্যদিকে বিয়ের ব্যাপারে তার কেয়ারিংয়ে, সান্নিধ্যে আকৃষ্ট নবনীতা

শায়েদের উদাসীন ব্যবহারে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হতে থাকে। বলে আমার আগের বিয়েটা প্রেমের ছিল না। বিয়ের পর এমন কোনো বিশ্বাস সে আমাকে দেয় নি সে বিশ্বাসভঙ্গ হয়েছে বলব... ভার্সিটিতে, আত্মীয়দের মাঝে অনেক রকম পুরুষ দেখেছি, শায়েদ একেবারেই আলাদা। আমার প্রতি তার আবেগ দায়িত্ব বোধ সব আছে, ওর বিয়েতে আপত্তি কেন ? আমি বিবাহিত ছিলাম বলে ? আমি একটা সন্তানের মা বলে ?

ছিঃ নবনীতাকে থামিয়ে নওশীন বলে, আমি খোঁজ করছি ওর ভেতরে কী, চল আমাকে একটু ভাবতে দাও।

তখন সব জানত নওশীন শায়েদের 'ওয়াহিদ' সম্পর্ক থেকে একজন মানুষের ব্যক্তিগত যা কিছু জানা যথেষ্ট তার প্রায় সবটাই। সে প্রতিবেলা প্রতিদিন আউলি বাউলি করে ঝাঁপ দিল নবনীতা আর শায়েদের সম্পর্কটা যাতে বিয়েতে গড়ায় এ নিয়ে। নিজের স্বভাবের বাইরে তাকে উত্যক্ত করে তুলতে চাইলে সরোষে দাঁড়ায় শায়েদ, তুমি জানো দাম্পত্য ঘর সংসার নারী আমার জন্য কী মানে রাখে, তুমি জানো তারপরও তুমি...? নওশীনও রীতিমতো ধারাল যুক্তি তোড় দিয়ে ঝাঁপ দেয় ? তুমি কী মিন করছ আমি বুঝছি না ? তোমাকে তোমার কোনো একটা সত্তার সাথে দাঁড়াতে হবে, এই রকম মিশ্র মানুষ হয়ে এই সমাজে কী করে বাঁচবে তুমি? ওয়াহিদই যদি তোমার পূর্ণাঙ্গ প্রেম হতো, তুমি ওর সাথে দেশের বাইরে চলে যেতে। কোনো নারীতে যদি তুমি না-ই জেগে উঠতে কিশোর বয়সে রাতে ওই কাজের মেয়েটার সামনে তুমি নপুংসক বোধ করতে... ভার্সিটিতেও একজন মেয়ে তোমাকে টেনেছিল, ওয়াহিদের প্রভাবে তুমি তার কাছ থেকে বিযুক্ত হয়েছ। শায়েদ, দাম্পত্য কোনো স্বপ্নের জায়গা না। এটা পরস্পরের মায়াময়তার মধ্যে একসাথে আবাসের জায়গা। আমার নিজেরও তো একজন পুরুষের সাথে বিয়ে হয়েছে, রাতের শরীর সম্পর্কটা আর কয় মিনিটের ? তাতে ক'জন তৃপ্ত হয়, ক'জন হয় না, ক'জন জীবন কাটিয়ে দেয় আপোষ করে, তার কী জানো তুমি ? আমি একজন মেয়ে হয়েও যদি তোমার সবচাইতে বেস্ট বন্ধু হয়ে থাকি আমার সঙ্গেই তুমি যদি সবচাইতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে থাক, তো ? বুকে হাত দিয়ে বলো, তুমি নবনীতার যে-কোনো বিপন্নতায় তার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছ কেন ? তাকে ভালো লেগেছে বলে নয় ?

ভালো লাগা আর বিয়ে অন্য কথা।

কী অন্য কথা ? তুমি ক'দিন এই বাড়ি ওই বাড়ি একা একা ঘুরপাক খাবে.. বয়স যত বাড়বে সবার ব্যস্ততা বাড়বে, আমাকেই বা কতটা সময় কথা বলার জন্য পাও বলো ? সেখানে ওর মতো ম্যাচিউরড স্বাবলম্বী মেয়ে তোমাকে পছন্দ করছে এটাকে তুমি এত...।

এরকম তর্ক-বিতর্কের মাঝখানেই দফায় দফায় ওদের একান্ত হওয়ার সুযোগ দিয়ে যেতে থাকে নবনীতা। একদিন নিঝুম ঘরের আবহ তৈরি করে নওশীন মুনিয়াকে নিয়ে বাইরে চলে যায়। মৌটুসি স্কুলে... কথা বলতে বলতে দুজন দেহ মিলনে একাত্ম হলে শায়েদ যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচে।

শফিউল-নওশীনদের কাছের কিছু বন্ধুদের নিয়ে এ বাড়িতেই তাদের বিয়ে হয়। সবাই এক ঘরে গাদাগাদি থেকে অন্য ঘরটাকে যদ্দুর সম্ভব শৈল্পিক আর নিখুঁত করে সাজিয়ে ছিল নওশীন।

আম্মু...মুনিয়া টানতে থাকে... আমাকে মৌটুসি তার কম্পিউটারটা আর ধরতে দিচ্ছে না, ওর নাকি অনেক পড়া... আম্মু আমাকে তুমি একটা ল্যাপটপ কিনে দেবে ? মুনিয়ার এই আবদারে বিস্ময় বোধ করে নওশীন, কী বলছ কী মুনিয়া ? ল্যাপটপ কী কোনো খেলনা ? তোমাকে এই বুদ্ধি কে দিয়েছে ?

মৌটুসি।

মৌটুসি বলে, আম্মু, তুমি জানো না কম্পিউটারে লেখার ব্যাপারে ও কেমন শার্প। আমি বাবাকে বুঝিয়ে বলে ওর জন্য একটা কেনার ব্যবস্থা করব। আমারটা নিয়ে আমিই কূল পাই না। এ দায়িত্ব আমার ও.কে ?

স্কুল থেকে বেরিয়ে এক সাথে বড়পার বাসায় যায়। কতকাল পর এ বাড়িতে এল নওশীন। আগে যখন মোবাইল ছিল না... জাস্ট ল্যান্ডফোন ছিল... তা-ও ছিল না, জাস্ট পত্র যোগাযোগই মাধ্যম ছিল... তারও আগে যখন বাহন ছিল পায়ে হেঁটে শত পথ পাড়ি দিত মানুষ... তখনো হয়তো মানুষের বাড়িতে মানুষের আসা যাওয়ার যোগাযোগটা এর চাইতে বেশি ছিল। এখন সবকিছু নাগালে। আর প্রযুক্তি তো বাতাসের চেয়েও দ্রুতগামী... কাল... যে... ফোন... যে টিভি কেনা হয়, পরশুর মডেলে তার চাইতে কয়েকগুণ বেশি উপকরণ যুক্ত। রিমোটে সব চলে, সেদিন টিভিতে বিজ্ঞাপন দেখাল বাইরে থেকে জানিস ?এসএমএস করলেই এসি চালু হয়ে ঘর ঠান্ডা হয়ে থাকবে। বড়পার সাথে এ নিয়েই কথা হয়, বড়পা হাসে, হবে কি পৃথিবীর ইতিহাস থেকে ডাইনোসর হারিয়ে গেছে আবার জন্মাবে।

মানে ? বুঝলাম না।

মানে একসময় ডাইনোসরের অলস লাগতে শুরু করল, সে উড়ার চাইতে হাঁটাচলা বসাতেই শান্তি বোধ করল। সৃষ্টিকর্তা তার ডানা কেড়ে নিলেন। এরপর এমন আরামে ডুবতে শুরু করল, তার হাঁটতেও ভালো লাগে না। সে পায়ের ব্যবহার বন্ধ করে দিল, সৃষ্টিকর্তা তার পা কেড়ে নিলেন।

বড়পা'র বাড়ির সামনে দাঁড়ায়। কী জানি কেন বড়পা গতকাল থেকেই তাকে কষে বলে রেখেছে, দুপুরে তার বাড়ি গিয়ে খেতে। সে নওশীনের পছন্দের রান্না করে তবেই নাকি আজ বেরিয়েছে।

আজ দু'বছরের বেশি পেরিয়ে গেছে বড়পা'র বাসায় এল। অথচ বাবা থাকে এ বাড়িতে। ফোনে খোঁজ নেয় নওশীন, কিন্তু কী এক আজব বোধে সে অনুভব করে, বাবার প্রতি তার তেমন টান নেই। বড়পা ব্যাপারটা আন্দাজ করতে পারে, এ জন্য এ নিয়ে কিছু বলে না নওশীনকে। বড়পা আগে অন্য বাসায় ছিল। সিঁড়িতে উঠার মুখে জিজ্ঞেস করে, ক'তলায়।

চাপা ঠোঁটে হাসে বড়পা, চারতলায়।

কী ? লিফট নেই ?

তুইও কি ডাইনোসর হলি ? তাহলে তো ওদের পয়দা শুরু হয়ে গেছে, তুইও কিন্তু একসময় বহুদিন পাঁচতলায় ছিলি।

তাই তো ? কী তরতর করে উঠতাম-নামতাম... হাঁপাতে হাঁপাতে সিঁড়ি বাইতে যাকে নওশীন, অভ্যাস যে কী মারাত্মক রকম খারাপ হচ্ছে। তা তিতলি কোথায় ?

ক্লাসে। এ ছাড়া আমাকে তোয়াক্কা করে নাকি ? রোজ এই খিটিমিটি অসহ্য লাগে। মায়ের প্রতি মায়া নাই যে মেয়ের, এ যে কী কষ্টের... আমি মরলেই বোধ হয় সে খুশি হয়।

চারতলায় উঠে রীতিমতো গোসল হয়ে যায়। বড়পা অনেক স্ট্রং। তার ঘাম ক্লান্তির বালাই নেই...। বড়পাকে নওশীন বলে, তিতলিকে নিয়ে এমনভাবে ভেবে নিজেকে কষ্ট দিয়ো না।

চাবি দিয়ে বড়পা দরজা খুলতে যাবে, তাকে নওশীনকে হতবাক করে দরজা খুলে যায়... দরজায় কেক হাতে দাঁড়িয়ে আছে তিতলি...তার কণ্ঠে গান—হ্যাপি বার্থ ডে হ্যাপি বার্থ ডে...। বড়পার বিস্ময় উচ্ছ্বাস তাকে যত ভাষাহীন করে তত তুমুল আনন্দ আরাম স্বস্তি মুখরতায় নওশীনের ভেতরটা

ভরে যেতে থাকে।

তোর মনে ছিল ? তুই বুঝতেও দিলি না ? আর ক্লাস বাদ দিয়ে এই দুপুরে।

ও. কে ওকে মা, রিলাক্স, দুপুরে না থাকলে খালামনিকে নিয়ে একসাথে সেলিব্রেট করার মজাটা পেতাম কোথায় ?

এক হাতে কেক নিয়ে আরেক হাতে তিতলিকে আমূল জড়িয়ে একদম অচেনা হয়ে উঠা বড়পাকে বাচ্চাদের মতো কাঁদতে দেখে নওশীন, আমার লক্ষ্মী সোনা। আমিই খারাপ... আমিই শুধু বকাঝকা করি... কোনোদিন আমাকে ছেড়ে যাবি না... আমি মরে যাব।

যা হোক দুপুরে বড়পার হাতের জম্পেস মজার খাওয়া খেয়ে বাবার খোঁজ নেওয়ার ফাঁকে তার হাতে কিছু টাকা দিতে চাইলে অবুঝ শিশুর মতো কাঁদতে থাকেন বাবা, আমি একটা অপদার্থ... রোজ অপেক্ষা করি, ক্যান যে আমার মরণ হয় না।

বাদ দেন বাবা, আমি মুনিয়া স্কুল সংসার নিয়ে অনেক ঝামেলায় থাকি। তারপরও আপনার জন্য মাঝে মাঝে আসব, আপনি একটু ভালো ফিল করলে ক'দিনের জন্য আমার বাসায়ও নিয়ে যাব বলতে বলতে তিতলি আর বড়পার মধুরতার অনাবিল শান্তির পরশ বুকে নিয়ে বাকি ক্লাস সেরে বাজার করে ঘরে ফেরে নওশীন। ক্লান্ত, বিকশিত দেহ বিছানায় ছড়িয়ে দিয়ে টিভি স্ক্রিনে চোখ রাখে, জাস্ট এক চিলতে শাড়িতে পুরো যৌবনকে বড় নান্দনিক কায়দায় জড়িয়ে জিনাত আমান মন্দিরের সিঁড়ি মুছতে মুছতে বুক ঝাঁপ দিয়ে দিয়ে আমান গাইছে, সত্যম শিবম সুন্দরম প্রভাত আলোয় এই দৃশ্যের কাব্যে শশী কাপুরের মতো নওশীনও মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে... অপার্থিব সুরে ডুবে। পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপারে শায়েদের মতে নওশীন বারোয়ারী। ক্লাসিক আধুনিক থেকে শুরু করে মুড অবস্থা বুঝে বাংলা-ইংলিশ ব্যান্ডের গানও তার পছন্দ। শুনতে শুনতে বিরক্ত বোধ করলে আবার পাখির পালকের মতো জল ঝেড়ে হাঁটা দেয়। অবশ্য সে দুর্দান্ত একাত্ম বোধ করে আর্টফিল্মে, কিন্তু তার জন্য যেহেতু বিশেষ আবহ আয়োজন তৈরি করার দরকার পড়ে তার, ফলে কমার্শিয়াল হিন্দি ছবি সে খুব দেখে। মারপিট মার্কা ছবি অবশ্য তার পছন্দ নয়.. মেলোডিয়াস প্রেমময় ছবিতে যেখানে নির্মাণে শৈল্পিক সৌন্দর্য থাকে তা দেখতে তার পছন্দ। শায়েদের সাথে একেবারে মনেপ্রাণে যেগুলো মিলে, সেগুলো নিয়ে তারা প্রচুর কথা বলে। দুপরিবারই একসাথে জাকির খাঁ'র তবলা চৌরাসিয়ার বাঁশি শিবকুমার শর্মার অনুষ্ঠান দেখতে গেছে নানারকম পথঘাট বের করে।

ড্রয়িংরুমে টিভি দেখছে শফিউল।

আর হাত পা ছড়ানো নওশীনকে যখন কুসুম জিজ্ঞেস করে আইজ কী রান্না অইবো ? মনে হয় আত্মা নয় মাথাটা ইটের ঘা খায়। আহারে আজ যদি কোনো অলৌকিক শক্তি এসে তার সব রান্নার কাজ করে দিত... বিছানায় এই ছড়ায়িত অবস্থা থেকে কিছুতেই ওঠা তো দূরের কথা মাথাটা তুলতেও ইচ্ছে করছে না। আহারে, শফিউলের যদি শায়েদের মতো রান্নার শখ থাকত! অথচ এটাই নবনীতার পছন্দ নয়। মানুষ আসলে এমন কেন ? নিজের যা আছে তা হাজার স্বস্তির আনন্দের হলেও কেন ওর মাঝে খুঁত বের করে অন্যে কিছুকেই অনেক আকাঙ্ক্ষিত মনে হয়, যা নিয়ে 'অন্য' হয়তো চরম বিরক্তিতে হিমশিম খাচ্ছে ?

মোবাইল ফোন বাজে, নাট্যোৎসব চলছে, নবনীতার সাথে কথা হয়েছে, তুমি কাল ফ্রি আছ ?

এখন তুমি আমাকে রাতের রান্নাটা করে দিয়ে এই মুহূর্তে বেহেশতি সুখ দিতে পারবে ?

নওশীনের বিবশময় আকুল স্বরে কিছুক্ষণ চুপ থাকে শায়েদ—এর আগেও প্রচণ্ড ক্লান্ত সুখ-অসুখের বিধ্বস্ততায় অথবা নিজের আরামকে তুমুলভাবে উপভোগের লোভে এমন কথা বলেছে সে শায়েদকে।

বাইরে থেকে এমন অবস্থায় খাবার আনিয়ে নাও না।

জানই তো বাড়ি ফিরে বাইরের রান্না খেতে পারে না শফিউল।

এ তোমার দোষ, শায়েদের কণ্ঠে ক্ষোভ, মানুষকে কিছু একটা ব্যাপারে অভ্যস্ত করতে হয়তো প্রথম প্রথম একটু টক্কর একটু যুদ্ধ করতে হয়, তা থেকে পালাতে তুমি গিয়ে সময়ভেদে গাধার বোঝাও বিরক্ত হয়ে টানতে পছন্দ করো।

পছন্দ করি ? এ আমার পছন্দ ?

বাবা বাক্যে ভুল হয়ে গেছে। তো এতই যদি রিঅ্যাক্ট করছ, আমিও সিরিয়াস হই। তোমার বাসায় আসি ? এসে রান্না করে দিয়ে যাই ?

ধুর! ফাজলামো করো না।

না না, আমি সিরিয়াস।

হয়েছে। থ্যাংকস।

ওঠ নওশীন... ভোর হলো দোর খুলো খুকুমনি ওঠোরে... রাতের রান্নার দিকে প্রেরণার ধাবমানতার বাতাস চালাতে থাকে নওশীন।

যেনবা বধির, এমনভাবে তন্দা মেরে, টিভিতে ডিসকভারি চ্যানেল দেখছে শফিউল... স্বার্থপর... অমানুষ... ভেতরে গজগজ করলে যেন জানে আরাম হয়। এরপর স্বয়ংক্রিয় মেশিনের মতো মনটাকে উড়ালে রেখে দুহাতের অভ্যস্ততায় রাতের রান্না সারে। যখন সব গুছিয়ে কুসুমকে টেবিলে খাবার দিতে বলছে, নওশীনের বুকটাকে রীতিমতো এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিয়ে কুসুম জানায়, দিনে বা'জানের ফোন আইছিল। মা'র শইলটা খুব খারাপ। কাইল আমারে নিতে আইব।

মাথাটা ঝিঝি করে উঠলে ঠান্ডা পানি খেয়ে নিজেকে সুস্থির করে বেডরুমে এসে ফ্যানের নিচে বসে। কুসুম যখন এসেছিল এই বাড়িতে, তখন সে বাল্যবিবাহিতা আর স্বামী পরিত্যক্তা। ধীরে ধীরে নওশীনের জীবন বাস্তবতা আর প্রগাঢ় মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হতে হতে দীর্ঘ বছর সে এখানে আছে। বাবা-মা এখন চায় আবার তাকে বিয়ে দিতে। কিন্তু কুসুম এখন আর গ্রামের জীবনে গিয়ে নিজেকে খাপ খাওয়াতে রাজি না। নওশীন ওর বাবা মা-কে বলেছে কোনোরকম মেট্রিক পাস বা ফেল ছেলেপেলে তাকে জানাতে, এ নিয়ে পরিচিত মহলে বিশেষত নবনীতাকে বলা আছে, ওদের প্রোডাকশন হাউজে একটা ছেলে নেওয়ার ব্যবস্থা রাখতে। নওশীনের এই প্ল্যান, কুসুমের বিয়ে হলে পাশের বস্তিতেই যাতে ওরা থাকতে পারে। তারপরও এরকম ফোন এলে কেমন যেন অদ্ভুত সব ভয় হতে থাকে তার। মেয়েকে মিথ্যায় ভুলিয়ে গ্রামের সবাই এক হয়ে যদি কারও ঘাড়ে ঝুলিয়ে দেয় ?

না। কুসুম এ ব্যাপারে তেজি আছে। সে নওশীনকে বলে, সে এমন একটা কাণ্ড ঘটতেই দেবে না। এমন একটা আচমকা স্বস্তিতে যখন বুকটা ফুরফুরে হয়ে ওঠে, তখন যেন মহাপ্রলয়হীন স্তব্ধতার তরঙ্গ ভেঙে ফোন বেজে ওঠে... ধীরলয়ে হেঁটে অলস নিথর কান পাতে নওশীন... হ্যালো ?

এটা শফিউল সাহেবের বাসা ?

হ্যাঁ, ডেকে দেব উনাকে ?

না... এরপর কিছুক্ষণ নীরবতা... খুব একটা পাল্টায় নি তোমার কণ্ঠ, নওশীন, আমি এক সপ্তাহের জন্য দু'দিন আগেই ঢাকা এসেছি।

একী ধবল স্নিগ্ধে আচমকা বর্শার ফণা ? একী নীলাভ বিষাক্ত হিমায়িত

ঠান্ডা ? স্মৃতির গূঢ় অন্তরাল থেকে উত্থিত একী ভয়ঙ্কর ভয় ? এক অমোঘ নিষাদ গহ্বরে টাল খেয়ে কাঁপতে থাকে নওশীনের পুরো অস্তিত্ব ? না... এ ভ্রম... এ বিভ্রান্ত... নামটা বললেই পরিষ্কার হবে... এবং সেই পরিষ্কার এখনকার নিকষ কালোর সব ছায়া মুছে নেবে... না... না... সেই নাম না শোনাই ভালো।

কম্পিত হাত থেকে রিসিভার খসতে চায়...

খানখান হয়ে যায় নওশীন।

আমি বলছি চিনতে পারছ না ? আমি সুদীপ্ত।

রাতে বিছানায় যখন দেহেপ্রাণে সমস্ত শক্তি হারিয়ে নিথর, হাত বাড়ায় শফিউল। অফিসে তার প্রমোশনের বাতাস কানে এসে লেগেছে কানে, সন্ধ্যা থেকেই ভালো মুডে আছে। এরপর, তুমি আমার জীবনে না এলে সব তছনছ হয়ে যেত, আমি কোথায় ভেসে যেতাম বলে আহ্লাদে যত দশখানা টান দেয়, তত নিজের এই ভয়াবহ মানসিক অবস্থায় টেনশনে ভয়ে কাদা কাদা হয়ে শফিউলকে আঁকড়ে ধরে সে, আমাকে ছেড়ে যাবে না তো ?

না, হঠাৎ এই প্রশ্ন ? এরপরই খেই হারিয়ে কাঁদতে থাকে, তবে কেন আমাকে ভয়ে রাখো, লুকাও... তোমার ভাবি ঢাকায় এসেছে... না না আগেই রাগ করো না, আমাকে বোঝার চেষ্টা করো, কেউ আমাকে বলে নি, আমি বুঝতে পারি, জীবনের এই পর্যায়ে আমি বড্ড বেশি ভয় পাই... তুমি ওর কাছে চলে যাবে না তো ? শফিউলের মুড ভালো, আরে থামো থামো। হ্যাঁ সে এসেছিল। তিলকে তাল বানিয়ে তুমি টেনশন করতে এইজন্যই বলি নি। একাকী মানুষ। বাবা বাড়িতে লাথিগুতা খেয়ে থাকে, প্রচণ্ড অসুখ নিয়ে এসেছিল। সুস্থ হয়ে এখন ফিরে গেছে ?... কী সব বলছ! বয়স হয়েছে না ?

সত্যি তো এই কথা ? কী ভয়টাই পাচ্ছিলাম, আমাদের অকূল পাথারে ভাসিয়ে তুমি ওর কাছে চলে যাবে।

পাগল ? বলে শফিউল বাতি নিভালে তার সত্তা থেকে নিজেকে বিযুক্ত না করার আকুলতা থেকে তাকে আঁকড়ে ধরে নওশীন।

রাত্রি গভীর হয়। বেঘোরে ঘুমুচ্ছে শফিউল। পাশে শুয়ে পেন্ডুলামের মতো নিজের বুকের ধরক শব্দ শুনতে শুনতে কোরাসময় এক ধ্বনির মধ্যে গিয়ে পড়ে। ওই একবেলার মধ্যেই গায়েহলুদ দিচ্ছে প্রতিবেশীরা... অনেকেই কটু মন্তব্য করে, ছেলের গার্জেন নাই, কেমন বিয়ে ? কারও মন্তব্য, হ্যাঁ পাড়ায় মেসে থাকতে এই পরিবারের সাথে যেমনে ল্যাপ্টায়া থাকত শফিউল... বদনাম তো কম অয় নাই... তা এরা কারও ধার ধারলে তো, বিয়া হইতাছে, ভালো হইছে।

নিথর নিশ্চল মৃতপ্রায় নওশীনের ব্যাকুল চোখ বারবার দরজায়... এই বুঝি ঝড়ের মতো বাতাসের মতো উদ্দাম বেগে দরজায় এসে দাঁড়াল সুদীপ্ত। ওমনই ও বিমূর্ত... ওকে বোঝা মুশকিল... শায়েদের ফোন পেয়ে চিরকুট পাঠিয়ে যে ঝুঁকি নিয়ে নদীর জলে ওকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে তার অনুভূতির কথা বলছিল, এরপর যে আমোঘ টানে জলারণ্যের ভয় এড়িয়ে বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে নিজের বিপন্নতা নিয়ে সুদীপ্ত ভেঙে পড়েছিল, সুদীপ্ত নিজের জীবনকে অবিন্যস্ত অবস্থায় ফেলে এদেশে জাস্ট নওশীনের বিয়ে ঠেকাতে কিছু সময় চাইতে ছুটে এসেছিল, প্রগাঢ় প্রেমের টান আর দায়িত্ব বোধ না থাকলে এভাবে ওর আসার কথা না। সে চিঠিতেই এটা তাকে জানাতে পারত। সে আকুল হয়ে নওশীনের কাছে কিছু সময় চাইতেই সাত সমুদ্রের চেয়ে বেশি কিছু পাড়ি দিয়েছিল, একটি বিয়ের প্রস্তাব আসার পর সেই সময়টাকেই মা তার শাড়ির কঠিন আঁচলে বেঁধে ফেলেছিল। না, নওশীনের কখনো সুদীপ্তর প্রতি কোনো অভিযোগ ছিল না। নিজের বাস্তবতার ফাঁদে এত তীব্রভাবে নওশীন নিজেকে বেঁধে রাখলে ওর নিঃশব্দে চলে যাওয়া ছাড়া আর কীইবা করার ছিল ?

বলুন, কবুল।

কাজীর এই কথায় একটি বড় নিঃশ্বাস আটকে পলকহীন চোখ কিছুক্ষণ দরজায় ঠায় গেঁথে রেখে বলেছিল নওশীন, কবুল।

এরপর নিজের এক সত্তা থেকে আরেকটা সত্তায় যুক্ত হয়ে সংসারে নিজেকে উপুড় করে দেওয়ার দশ-বারোদিনের মধ্যেই মাথা ঝিম ঝিম... উগড়ানো বমি... এই ভয়টা তো সে সুদীপ্ত চলে যাওয়ার এক মাসের মধ্যেই পাচ্ছিল। কিন্তু ভেতরের আরও দুর্মর টেনশনে অবসাদে মাঝে পড়ে এই বাস্তবতার মুখোমুখি আর দাঁড়ায় নি নওশীন।

এখন দাঁড়াতে হবে।

পৃথিবী আঁধার করে মাথার মগজ আর মনের মধ্যে আউরি ঝাউরি জট লেগে যায়। কী করে সে হায় সে কী করে ? ভেঙে পড়ে শায়েদের সামনেই। শায়েদ তখন এমন অবস্থায় পড়া কোনো মেয়ের মা'র চাইতেও সাবধানী আর দায়িত্ববান। ওর সাহসে জোরেই ভোরে ইউরিন টেস্টে পাঠানো হয়।

পরদিন রিপোর্ট পজেটিভ এলে উন্মাদ প্রায় হয়ে নওশীন ভোরে হাসপাতালে ছুটে যায়। পনেরো দিন আগে তার বিয়ে হয়েছে, বিকারগ্রস্থের মতো বলতে থাকে আমি বিবাহিতা... শফিউলেরই সন্তান। তাকে থামাতে বিন্যস্ত করতে পাগলপ্রায় বোধ করে শায়েদ। কিন্তু নওশীনের চোখে জল আর আত্মায় বেদন রক্তের ধারা। ডাক্তার যতক্ষণ না বলবেন... কোনো অনিশ্চয়তা তার মধ্যে থাকবে না সে।

ভোরের ধবল আলো আঁধারের তরঙ্গ ঠেলে মুখোমুখি হয় ডাক্তারের।

লাস্ট কবে পিরিয়ড হয়েছিল ?

ডাক্তার তারিখ শুনে বলেন, আপনার এখন দেড় মাস চলছে।

ভাগ্যিস ঘরে ফোন ছিল না। নইলে শফিউল ফোনে খোঁজ নিয়ে জেনে যেত, সকাল সকাল সে অফিস যেতেই নওশীন কোথাও বাইরে যায়।

শায়েদের সাথে নিথর মূর্তির মতো রিকাশায় বসে... আসন্ন দুপুরে ক্রিসেন্ট লেক ফাঁকা। সেখানকারই একটা কৃষ্ণচূড়া গাছের নিচে বসে নওশীন ঠান্ডা কণ্ঠে বলে, আমি শফিউলকে সব বলে দেব।

পাগল হয়েছে তুমি ? এরপর অনেক অনেকক্ষণ ব্যাপারটার বাস্তব প্রেক্ষিত বোঝায় শায়েদ তাকে, তাহলে বিয়ে করলে কেন ? এখন এটা প্রকাশ করলে শফিউল তোমাকে খুন করে ফেলবে... সুদীপ্তর নাম শুনলেই ওর মাথায় কেমন রক্ত চড়ে, জানো না ? আর সব বাস্তবতা জেনে সমাজের ধিক্কারে তোমার মা বেঁচে থাকবেন মনে হয় ?

তা হলে আমি আত্মহত্যা করব।

তুমি ? যার গল্পে ভাবনায় ভ্রূণ... শিশুকে নিয়ে এত আবেগ... এত মমতা... তুমি নিজেকে হত্যা করলে, যে এসেছে তাকে কীভাবে বাঁচাবে ?

তক্ষুনি মফস্বলের স্মৃতির আসমান ধরে অলৌকিক আলোকস্কটার পথ ধরে নওশীনকে আমূল কাঁপিয়ে বুলবুলি কাঁধে এসে বসে ফিসফিস করে বলে, আমি এসেছি। বলেছিলাম না, আমি আসব ? কী যে হয় নওশীনের, এক অদ্ভুত ঘোরশক্তিতে সে শায়েদকে অবাক করে দিয়ে চক্রাকারে ঘুরতে থাকে। আমি আর কিছু ভাঙতে দেব না। বাবুই পাখির মতো আমি শুধু বুনেই যাব... তাতে যা সত্য-মিথ্যার পরীক্ষার পাকে পড়তে হয়, আমি পড়ব।

বাড়ি ফিরে ফের নিজ সত্তা থেকে

বিযুক্তি ঘটে ঘরসংসার সামলানো আর শফিউলের সামনে দাঁতে দাঁত চেপে সুস্থতার ভান করে হেসে যাওয়া। সেইসব দিনের মুহূর্ত মিনিট ঘণ্টা কীভাবে কেটেছিল এ ভাবতে গেলেই যখন মাথা ঘুরিয়ে পাহাড়পতন ঘটেছে নওশীনের... নওশীন ভাবতে চায় নি, নিজের মনকে কোনোদিনও জিজ্ঞেস করে নি, তুমি কেমন আছ ? কেবল প্রতি অনুভবে এই বিন্যস্ত স্থির করেছে নিজেকে, এ সন্তান তার গর্ভের। এই সত্যকে নির্মাণ করে তোতা পাখির মতো মুখস্থ করিয়েছে, এর বাবা শফিউল। তাতে করে সারা পৃথিবীতে যে শান্তির প্রচ্ছায়া উজ্জ্বল হতে দেখেছে, ওর সামনে ধীরে ধীরে আর সব কিছুই তুচ্ছ হয়ে গেছে। আরও পনেরো দিন পর মানে বিয়ের একমাস পর যখন দেহমন বমি আর অশরীরী আঁধারের সাথে পারছিল না... এর আগে থেকেই অবশ্য কিছু কিছু লক্ষ করছিল শফিউল... নানাভাবে এড়িয়ে গেছে নওশীন, মাস শেষের ক'দিন পর দুজন পাড়ার ডাক্তারের কাছে যায়। ডাক্তার কবে শেষ পিরিয়ড হয়েছিল জিজ্ঞেস করলে, আন্দাজমতো নওশীন সোয়া মাস কমিয়ে বলে।

তখন চিকিৎসাব্যবস্থা এত আধুনিক ছিল না। ছিল না গর্ভের সন্তান নিয়ে আলট্রাসনো বা এত হ্যাপা...তলপেটে হাত দিয়েই অন্তত পাড়ার ডাক্তারের অতকিছু নিখুঁতভাবে বুঝে ফেলা সম্ভব হয়ে ওঠে নি। সব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এক অদ্ভুত ভারমুক্ত নিঃসীমে নিজে ছেড়ে দিয়ে যেন কোন মামলার আসামি এক রুদ্ধশ্বাস অবস্থা থেকে মুক্তি পেল এই স্বস্তিতে যখন লম্বা দম নিচ্ছে নওশীন আচম্বিতে মুখ আঁধার করে শফিউল বলে, এত জলদি বাচ্চা ? তাও আমাদের এমন আর্থিক অবস্থায় ? তুমি ঠিকমতো পিল খাও নি ?

পিল খাও নি ? নি নি নি... যেন অনন্তকাল পর ইকো হতে থাকে কানে শব্দাবলী। ওই অবস্থায় যেনবা এক খুন হয়ে যাওয়া, সব ধ্বংস হতে থাকা অবস্থা থেকে যে-কোনো কায়দার আশ্রয়েই হোক, দুর্মর এক ভয় টেনশন থেকে মুক্তির পর শফিউলের ওইসব কষ্ট আফসোস তিরস্কার তেমন কোনো প্রভাব ফেলে নি নওশীনের মধ্যে। কিন্তু ক'মাস পেরুতে থাকলে যখন গর্ভে বড় হচ্ছে ভ্রূণ... এবং যে রাতে প্রসব বেদনা ওঠে নওশীনের সেই মাসগুলির মধ্যে মুহূর্তে মুহূর্তে ভর করত ভয়... কাউকে ফাঁকি দেওয়ার অপরাধবোধ পাপপুণ্যের মিলন অমিলনে পাগলপ্রায় বোধ করত নওশীন। বিশেষত যে সন্ধ্যায় প্রসববেদনা ওঠে সেই রাতে যত না গর্ভযন্ত্রণা তার চাইতে মানসিক ভারসাম্যহীন বোধে আত্মহত্যার জন্য হাসপাতালে ছুরি খুঁজেছিল সে, যখন শফিউল আনন্দে হাহাকারে বলছিল, ছেলে হলে একদম আমার মতো হবে...।

ছটফট করে কাঁপতে কাঁপতে বিছানায় উঠে বসে নওশীন। মশারি সরিয়ে ভারী দুটি পা হেঁচড়ে হেঁচড়ে ড্রয়িংরুমে গিয়ে বাতি জ্বালায়। ডাইনিং-এ রাখা জগ উপুড় করে দেয় মুখে। পুরো শরীর ভিজে যায় প্রায়।

ধীরে ধীরে প্রায় হাঁপাতে হাঁপাতে সোফায় এসে বসে। এতদিন এতকাল পর সুদীপ্ত কেন নওশীনের খোঁজে এল ? কী ইচ্ছা তার কী ? উদ্দেশ্য ? ওর বিয়ের ক'মাস পর এসেছিল সুদীপ্ত, শায়েদকে আঁকড়ে একেবারে ভেঙেচুরে জানিয়েছিল সে ধীরে ধীরে ওপারে তার পরিবারটাকে গুছিয়ে আনতে শুরু করেছে অন্তত বাবার বিন্যস্ততার জন্য। ঠাকুরদা মৃত্যুশয্যায় সবার সম্পত্তি ভাগ করে দিচ্ছে, এমন কি সুদীপ্তরও। ওর ওপর দাঁড়িয়েই সুদীপ্ত কিছু একটা করতে পারত। কেন নওশীন তার জন্য অপেক্ষা করল না ? শায়েদ তিল তিল করে নওশীনের জীবন বাস্তবতা সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার পর সুদীপ্ত বলছিল, আমি এদেশে আর জীবনে ফিরব না। আমৃত্যু পা রাখব না এদেশের মাটিতে, নওশীনকে জানাবেন ধীরে ধীরে আমাকে ভুলে যেন নিজের জীবনটা গুছিয়ে নিতে পারে।

সেই সুদীপ্ত... এই একফোঁটা কাঁটাতার পেরুলেই ঢাকা-কলকাতা এ্যাদ্দিনের এই জীবনে নওশীনের জানামতে কোনোদিন আসে নি, ফোন করে নি। আজ একেবারে এই শহরে এসে তার নাম্বার জোগাড় করে এত আকুল করা কণ্ঠে ফোন করল ? কেন ?

কানে বাজে শায়েদের কাছে বলে যাওয়া সুদীপ্তর কণ্ঠ, নওশীন যেন জীবনে কিছুর বিনিময়ে সাহিত্যচর্চা না ছাড়ে। এই কথা কেন বলেছিল জীবনের সাথে বাঁচার জন্যই সে যে আপোস করেছে করুক, কিন্তু ওর লেখার কলম অনেক শক্তিশালী। কিছুর বিনিময়ে এটা যেন সে না ছাড়ে।

হাঁ। সাহিত্য। জীবনের হাজার পীড়নে দুঃসহ ক্ষণ ক্ষণ বাঁচার চলার দুর্মর পেষণে কখন খণ্ড খণ্ড তুচ্ছ হয়ে গুঁড়িয়ে গেছে সাহিত্যের বাক্য শব্দাবলী। ছিন্নভিন্ন বিক্ষিপ্ত ভাবনা মাথা বিন বিন করে। শায়েদকে ফোন দেবে ? ভাবতেই এক দুর্মর শক্তি জাগে দেহে। মুহূর্তে চোখ যায় ঘড়িতে, রাত তিনটা।

ফের থিতিয়ে আসে... আউলি ঝাউলি বাউরি বাতাসের মতো এগিয়ে আসে জীবনের কষ্টকর গোপন ফাঁস হয়ে যাওয়ার সেই দুঃসহ দিনটি। এরপর সেই দিনের সূত্র ধরে আরও আরও সুক্ষ্ম সত্যের উন্মোচন। যত উন্মোচিত হচ্ছিল, তত এক বিমূঢ় তাজ্জবে বাকহীন বোধ করছিল নওশীন। বিয়ের কয়েক বছর পর মা'র বাড়ি গিয়ে দরজায় পা রাখতেই শুনতে পায় বড়পার সাথে মা'র জবরদস্ত যুদ্ধ শুরু হয়েছে। রিকশা থেকে নেমে এক হাতে লাগেজ আরেক হাতে মুনিয়াকে সামলে সে সেই তর্কের মধ্যেই ঢুকে পড়তে পা বাড়িয়েছিল, কিন্তু বড়পা যখন চিৎকার করে বলতে থাকে, শফিউলের সাথে যুক্তি করে চালাকির বিয়ে আপনি নওশীনকে দিতে পারেন আমি স্পষ্ট কথার স্পষ্ট মানুষ, আমাকে নিয়ে দয়া করে এই খেলা খেলবেন না।

দরজার মধ্যেই নওশীনের পা স্থবির হয়ে যায়।

এরপর কখনো নওশীনের জেদে, আকুতিতে, নানারকম প্রশ্নবাণের জর্জরিত উত্তরে বেরিয়ে আসতে থাকে এক অদ্ভুত চালাকিময় খেলার চিত্র। ঢাকা গিয়ে চাকরি পেয়েই শফিউল এসেছিল নওশীনদের বাড়িতে, নওশীন তা জানে, চাকরির মিষ্টি খেয়েছে আড্ডা দিয়েছে, কিন্তু যা জানে না মা-কে সে সুকৌশলে জানিয়ে গেছে যে নওশীন এক হিন্দু ছেলের সাথে ভেগে যেতে পারে যে-কোনো সময়, সে নওশীনের পরিবারে শুভার্থী, যত জলদি সম্ভব সে নওশীনকে বিয়ে করতে চায়। মা'র মাথায় আসমান ভেঙে পড়লে তিনি আছারি বিছারি করে নওশীনকে খুঁজতে যাবেন, শফিউল থামায়। বলে এইভাবে বিয়ে করলে সে পুরনো প্রেমকেও ভুলতে পারবে না, আমাকেও সম্মান করবে না। আপনার মেয়েই অসুখী হবে। এরপর গ্রাম থেকে বিয়ে আসার প্রস্তাব সম্পর্কে সমস্ত পরিকল্পনা মা'র মাথায় ঢুকিয়ে দিয়ে বলে, ওর দিশেহারাহীন অবস্থায় ওকে আমি বিয়ে করলে আমার প্রতি তার সারা জীবন শ্রদ্ধা থাকবে। ঋণ বোধ থাকবে। সুদীপ্ত'র নাম ভুলেও মুখে আনবে না। কারণ সে এ ব্যাপারটা আমাকে বিশ্বাস করে শেয়ার করেছে। মাঝখান থেকে শফিউল তার সাথে বেঈমানি করেছে এটা ভেবে বিয়ের ক্ষেত্রে নওশীন বেঁকে বসতে পারে। আর অন্তত শফিউল নওশীনের সাথে জোরজবরদস্তির বিয়ে করে নিজের সম্মান খোয়াতে রাজি না, আর এসব করার জন্য নওশীনের জন্য নওশীনের প্রতি তার যে গভীর প্রেম দরকার তা তার মধ্যে নেই।

এক আকুল করা হুহু ক্রোধে সে শায়েদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, বিয়ে দেওয়ার জন্য আমার মা আমার জানের ওপর এসে বসেছিল, সুদীপ্তর জন্য অপেক্ষা করার ন্যূনতম অবকাশটা পর্যন্ত আমি পাই নি, শফিউল তো তোমাদের সাথেই থেকেছে অনেকদিন, এই সুক্ষ্ম চালাকিটা তুমি জানতে ? আমার মাথা আঁধার হয়ে আসছে। ও

মাই গড! আমার পুরো জীবনটার শুরুর মুহূর্তে একী নিখুঁত নাটকের খেলার মধ্যে আমাকে সবাই হয় মৃত্যু নয় শফিউল—এমন একটা ভয়ঙ্কর অবস্থার মধ্যে নিয়ে ফেলল ?

থাম নওশীন। ক্রন্দিত কম্পিত নওশীনকে প্রাণপণে থামানোর চেষ্টা করে শায়েদ। বিশ্বাস করো এই ব্যাপারটির ন্যূনতম আভাস আমি পাই নি... মানে, যেদিন তোমার বিয়ে হলো তার আগে তোমাকে নিয়ে শফিউলের মধ্যে কোনো আবেগ উত্তাপ আমি দেখি নি।

আমার সাথে ওর পক্ষ হয়ে আর একটা আরেকটা মিথ্যা কথাও তুমি বলবে না।

কেন বলব ? তুমি আমার বন্ধু... সব শুনে আমার মাথাটাই এখন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে, একটু ভেবে শায়েদ বলে, তবে তোমাকে আমি লুকাব না... ওর চাকরিটা যখন হবে হবে অবস্থা তখন ওদের গ্রাম থেকে একজন বিধবা মহিলা এসে উঠেছিল ওর ফ্ল্যাটে। আমি একদিন আচমকা গিয়ে অবাক হয়ে মহিলাকে শফিউলের পায়ের কাছে বসে কাঁদতে দেখি।

শফিউল মহিলাকে বলেছিল, এমনিতেই আমি পরিবার ছাড়া এতিম জীবনযাপন করছি... আমার পরিবারের প্রতি আমার যে টান যে মায়া, তা তুমি ছাড়া কে আর বেশি বুঝবে ? কিশোর অবস্থা থেকে আমাকে তুমি দেখে এসেছ। তোমাকে বিয়ে করলে তুমি আমি কেউ সুখী হতে পারব না। তোমার বাড়ি আমার বাড়ি আমাদের গ্রামে যে কলঙ্ক হবে, তাতে আমরা কেউ শান্তি পাব না। তুমি যেভাবে নিঃশব্দে এসেছ, সেইভাবেই চলে যাও। কেউ যেন না জানে, তুমি এখানে এসেছ। রুদ্ধশ্বাসে কথাগুলো শোনে নওশীন, তারপর ?

এরপর আমার সাথে দেখা হয়ে যায় শফিউলের। সে ধীরে ধীরে আমার সাথে সহজ হয়ে বোঝায়, তাদের গ্রামেরই এক বিধবা নারীর সাথে তার কথাবার্তাহীন একটা প্রেম-প্রেম ভাব শুরু হওয়ার সাথে সাথেই গ্রামে এত বাজে গুজব রটে, পরিবারে এত অশান্তি শুরু হলো যে সে সবাইকে ত্যাগ করে আসতে বাধ্য হয়েছিল। এখন লাজলজ্জা ভুলে সেই নারী আবার তার ফ্ল্যাটে এসে উঠেছে।

ওই ফ্ল্যাটে ওরা দুজন ক'দিন ছিল ?

আমার তো মনে হয়, আমি যেদিন গেছি ওই একবেলাই।

মিথ্যে বলো না... কসম লাগে, ক'দিন ছিল ?

আমি কী জানি ক'দিন ছিল ? ক্ষেপে যায় শায়েদ, ক্রমশ শান্ত হয়ে বলে তবে ওই মহিলার প্রস্থানের পরই সে আচমকা তোমাকে কেন্দ্র করে তার আবেগ প্রকাশ করে আমাকে... বলে, আসলে নওশীন সুদীপ্তকে ভালোবাসে এই জন্যই আমি ওকে নিয়ে আমার এই অনুভূতি প্রকাশ করি নি। কিন্তু এখন যেহেতু সুদীপ্ত ওর জীবন থেকে চলে গেছে, কোনো এক গ্রামে ওর মা ওকে বিয়ে দেওয়ার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে, এটা আমি হতে দিতে চাই না। ক্লাস ফাইভ থেকে ওকে আমি চিনি, প্রচণ্ড সহিষ্ণু, সাংঘাতিক ব্রিলিয়েন্ট মেয়ে, ছোটছোট অনুভূতির মিশেলের সাথে ওর প্রতি দীর্ঘদিনের এক মায়ায় জড়িয়ে গেছি আমি বলতে বলতে শায়েদ নিঃশ্বাস নেয়, ওর মধ্যে যে এত সব চালাকির চক্র ছিল আমি ভাবতেই পারছি না।

আমাকে ঠকিয়ে কোনঠাসায়ে ফেলে বিয়ে করে এখন মহামানব সেজেছে ও, আমি করব না এই সংসার, সব ভেঙে তছনছ করে দেব।

মুনিয়ার কথা ভাবো... যেন বজ্রপাতের বদলে মাথার ওপর এক হিমশীতল ছায়া এনে দিতে থাকল শায়েদ, তুমি মুনিয়াকে নিয়ে কোথায় যাবে ? নিজের অজান্তেই যে বাবার ছায়াটা ওর মাথার ওপর রেখেছে শফিউল সেটাকে গুরুত্ব দাও, এই জায়গায় কি তুমিও মিথ্যাচারী নও ?

কিছুক্ষণ গুম মেরে থেকে ফুঁসে ওঠে নওশীন, ও এই খেলাটা না খেললে এইসব কিছুর জন্ম হতো না। মা-কে আমার অচেনা অদেখা এক গ্রাম্যপত্রের প্রলোভন দেখিয়ে রীতিমতো উন্মাদ বানিয়ে চলে গেছিল সে। মা কোনো একটা নিশ্চিত প্রস্তাব পেয়ে যেভাবে আমার প্রাণের ওপর কাঁপিয়ে পড়েছিল, এসব বুদ্ধি মা-কে ও না দিলে মা তা পড়ত না। বড়পা আছে না নিজের মতো ? আমিও তখন এমন দিশাহীন অবস্থায় সুদীপ্তকে ডাকতাম না... বেচারা অসহায় বিপর্যস্ত সুদীপ্ত আমাকে আঁকড়ে ধরে ভিখিরির মতো কিছু সময় চেয়েছিল আমার কাছে। ও এই নিখুঁত প্ল্যানটা না করলে আমি সুস্থিরভাবে সময় নিয়ে সব ভাবতে পারতাম। একজন আরেকজনকে পাব না হারাব এই টানাপড়েনে আমাদের মধ্যে যা ঘটেছিল... যে অপ্রত্যাশিত দুঃস্বপ্নের মতো মুনিয়া এসেছিল জীবনে, আসত না।

নওশীনের কান্নায় চরাঞ্চল ভাসতে থাকলে শায়েদ সস্নেহ হাত রাখে তার মাথায়—কী করলে কী হতো না, এ ভেবে মাথাকুটে মরলেও কী তুমি এক মুহূর্তের আগের জীবনটা পাবে ? বরং ধীরে ধীরে নিজেকে শান্ত কর। এটাই তোমার নিয়তি ছিল, এভাবেই ভাব।

তুমি নিয়তিতে বিশ্বাস করো, যে আমাকে আশ্বাস দিচ্ছ ?

তুমি তো করো। হা গ্রিক ট্যাজেডি নওশীন, যা দিনরাত যা তোমার মাথা খেত... এখন তুমিই একজন গ্রিক কন্যা।

আমি এত অশ্রদ্ধা নিয়ে কী করে ওর সংসার করব ?

মুনিয়ার ব্যাপারটা নিজের মধ্যে গোপন রাখাই এখন তোমার মূল লড়াই। মানুষ যদি পেছনে হাঁটতে পারত তবে যা খটকা যা ভুল সব মুছে মুছে ফের এসে সামনে দাঁড়াতে পারত। তুমি ভাব মুনিয়ার ব্যাপারের সত্যতার এক ছিটেকণা মাত্র সত্যও যদি শফিউলের সামনে আসে, সে

তোমাকে মুনিয়াকে কেটে ফালা ফালা করে নদীর জলে ভাসিয়ে দেবে না? তুমি অতীতের ওই মুখটাকে ভুলে সব জানলে শফিউলের তোমার প্রতি অশ্রদ্ধার এই রূপটা কল্পনা করো। তা বলে বলছি না এ নিয়ে তুমি এখন থেকেই ফের আবার টেনশনে ডুব দাও। জাস্ট এই মুহূর্তে এটা ভেবে নিজেকে শান্ত করো। সময় সব ঠিক করে দেবে।

হা সময়!

যখনই ছুঁতে যাবে সময়কে নওশীন... জিভ দিয়ে স্পর্শ করতে চাইবে তখন আচমকা চমকে ওঠে।

ড্রয়িংরুমের সামনে ঘুম ঘুম চোখে এসে দাঁড়িয়েছে শফিউল, এত রাতে এখানে বসে আছ?

এক মহা জীবনের চক্কর থেকে নিজেকে কষে বেঁধে নড়েচড়ে স্থির হয়ে বসে নওশীন, ঘুম আসছে না।

এ যে এক কী রোগ তোমার, বলতে বলতে ডাইনিং স্পেসের দিকে এগিয়ে যায়।

কী ব্যাপার ঘুম ভেঙে গেল?

বাথরুম পেয়েছিল, উঠে দেখি পাশে তুমি নেই... রাতের শরীর তৃপ্তিতেই নাকি অন্যকোনো আমেজে শফিউলের ঘুমের কণ্ঠে আজ বিরক্তির বদলে আবেগ, ঘরে পানি ছিল না, খুব পিপাসা পেয়েছে, তা আজ ঘুমের ঔষধ খাও নি?

খেয়েছি। কাজ করছে না।

কিছু নিয়ে বেশি টেনশন করছ নাকি?

না, ঠিক তা-না, আসলে সন্ধ্যায় মুনিয়ার সম্পর্কে যা বললে তা-ই চোখ বুজলেই তিল থেকে তাল হয়ে মাথা খারাপ করে দিচ্ছিল।

এ জন্যই এসব ব্যাপার তোমার কাছে শেয়ার করতে ইচ্ছা করে না... ঢকঢক করে গলায় পানি ঢালে শফিউল। কোনো একটা বিষয় নিয়ে আজাইরা টেনশন করে দিন হারাম, ঘুম হারাম করাটা তোমরা একটা ফালতু ফ্যান্টাসি। তুমি এটা নিয়ে ঘুম হারাম না করে *প্রাকটিক্যালি* কিছু ভাবলে এই যে টেনশন এ থেকে বেরুতে পারলে তিল থেকে তাল হওয়া কষ্ট থেকে বাঁচতে পারতে। এসো শুতে এসো, এ নিয়ে দিনে ভাবনাচিন্তা করে ওর জীবনটা নিয়ে প্রাকটিক্যালি কোনো সিদ্ধান্ত আসা যাবে। এসো।

এই আষাঢ় মাসে টানা ক'দিন এমন প্যানপ্যানে ছিচকাদুনে বৃষ্টি হচ্ছে, যে বৃষ্টির জন্য উন্মাতাল থাকত নওশীন... বাদলা দিনের পাগল হাওয়ার উচ্ছ্বাসে বয়সের যে-কোনো পর্যায়েই ছাদের মধ্যে উন্মাতাল হয়ে ভিজতে পরোয়া করত না কিছুর... রোজ সকালেই এই ঝিম ঝিম আবহাওয়ার গুমোট গুমোড় পতনময় বিচ্ছিরি বেজার মুখ দেখে মন বিষণ্ন হওয়ার সাথে সাথে বিগড়েও যায় মাঝে মাঝে। ঘরের বইপত্তর আসবাব স্যাঁতসেঁতে কাপড়ের ভাঁজে ভাঁজে নোংরা স্তূপ জমছে। ছাদে শুকানোর অভ্যাস নওশীনের। তা অবশ্য এ বাড়ি আসার পর। আগের বাড়িগুলোতে তো কখনো দুটো ঘরে দড়ি টাঙিয়ে ফ্যান ছেড়ে আগে কড়া ভেজা কাপড়ের জলের মেজাজ কমাত, এরপর বিদ্যুৎ বাঁচানোর জন্য ফ্যান বন্ধ করেই লটকে পটকে ওই দড়ির নিচ দিয়ে আসা-যাওয়া করত।

বাঁচোয়া এটাই, কুসুম শেষ পর্যন্ত বাবার অসুখ সম্পর্কে মিথ্যাচার খবর তারই আরেক বোনকে ফোন করে শুনেছে। গ্রামের এক লোক পাঁচ সন্তান নিয়ে বিপত্নীক হয়েছে, কুসুমকে তারই ঘরনি বানানোর জন্য বাড়ির লোকজন আটসাট বেঁধে আসতে চাইছিল।

কুসুম-এর মাঝেও জরুরি কাপড়গুলো রোজ ধুয়ে ড্রয়িংরুমের প্লাস্টিকের দড়িতে শুকাতে দেয়। চায়ের সাথে পাউরুটি টোস্ট মুখে দিয়ে পেপার উল্টায় নওশীন। এই বর্ষায়ও সোহরওয়ার্দী উদ্যানের একশ'র মতো রেইনট্রি মৃত অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। ক্রমে ক্রমে আরও বৃক্ষও মৃত্যুর প্রহর গুনছে। প্রতিদিনের জলপতনেও এদের ভেতর নিঃশ্বাস আসে না। কেন এমন হচ্ছে, এ নিয়ে কারও কোনো বিকার নেই। ক'জনকে জিজ্ঞেস করে জানা গেছে বছর আগে এই গাছগুলোর নিচে গরম পিচ ঢেলে রাস্তার কাজ চলেছে ক'মাস, মূলত তারপর থেকেই—।

না এদেশে বৃক্ষ নদী পাখি থাকবে না... এ প্রসঙ্গে যারা সংবেদনশীল তাদেরকে দুর্বলচিত্ত বলে অভিহিত করা হয়।

ঘড়ি দেখে। বাথরুমে ঢুকেছে শফিউল। নিজেকে তৈরির পোশাক রাতেই ঠিক করা থাকে। নাস্তা সেরে কাপড় চেঞ্জে যাবে, দেখে ধীরে ধীরে ছাদ থেকে নিচে নেমে আসা মুনিয়ার চোখ জলে ভরা।

আরে? তুমি কখন ছাদে গেলে? আমি ভাবছি ঘুমাচ্ছ। তা, তুমি এত ভোরে ছাদে?

নওশীনের হাত ধরে টানে মুনিয়া, ছাদে আসবে দেখো।

মুনিয়া আমার ক্লাসে দেরি হচ্ছে, বিকেলে যাব? তুমি কাঁদছ কেন?

নীল টুনিদের ছেড়ে তার বাচ্চারা আলাদা গাছে ঘর বানিয়েছে। মা, বাবা মা নীলটুনি কাঁদছে না কেন? ওরা কী দুঃখে পাগল হয়ে গেছে?

সস্নেহে মুনিয়ার মাথায় হাত রাখে নওশীন, পাখিদের অতদূর ভাবার ক্ষমতা থাকে না। বাচ্চা ছোট থাকলে তারা চিনতে পারে, বড় হলে ওদের কে কার সম্পর্কে কী হয় এটা বুঝতে পারে না। তুমি *এ নিয়ে* এখন মাথা ঘামিও না, এখন নাস্তা খাবে এসো।

এদ্দিন মৌটুসি আর শফিউলের অফিস ছিল একই সময়ে। দুজনের একজনকে আরেকজন নামিয়ে কর্মস্থলে পৌঁছাতেই হিমশিম খেতে হতো। ভার্সিটিতে ঢোকার পর মৌটুসির ক্লাসের সময়ের হেরফের ধরে কখনো গাড়ি পায় নওশীন, কখনো না।

তার ইস্কুলের চাকরিটা এই পরিবারের জন্য এত জরুরি না, যেমন একসময় ছিল। বিয়ের পর নানা প্রতিবন্ধকতার মাঝে নওশীন একদিকে *সংসার সামলাচ্ছে* অন্যদিকে ড্রপ দিয়ে দিয়ে প্রাইভেটে বিএ. এম. এ. করছে। ওই পড়ার সূত্র ধরেই তার নিচের ক্লাসের ছাত্রীদের বাসায় জড়ো করে টিউশনি করে টাকা উপার্জন করেছে। মেধা তো ছিলই ওর মধ্যে দুর্দান্ত। সে হাজার আপোস *প্রতিকূলতার মধ্যেও* বিশ্বাস করত, একজন নারী যতবার তার ন্যূনতম খরচের জন্য স্বামীর সামনে হাত পাতবে ততবার সে ঘরের হাজার কাজ করেও স্বামীকে দানদাতা হওয়ার সুযোগ দেবে। অর্থনৈতিক মুক্তি ছাড়া একজন নারীর কোনো মুক্তি নেই। লালন-সুমাইয়া যখন ওই শহরের বাস্তবতার টানাপড়েনে অস্থির। লালন তো নিজের একটা কাজের ব্যবস্থা করে নিয়েছিল, সুমাইয়া তো বলা যায় গৃহবন্দি অবস্থায় পড়েছিল। যখন লালন সুমাইয়াকে নিয়ে দেশ ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেয় তখন বলে নওশীনকে, সুমাইয়ার আত্মমর্যাদা বোধ আর পড়াশোনা শেষ করে নিজ পায়ে দাঁড়িয়ে বিয়ের ব্যাপারটাকে আমি অনেক সাধুবাদ জানিয়েছিলাম, তোমাকে নিয়ে আমার একটা কষ্ট রয়ে গেল, যে বয়সে তোমার বিয়ে হচ্ছে, *সারা* জীবন না তুমি স্বামীর দাসত্ব করে কাটিয়ে দাও। জানি অনেক কষ্টের, তারপরও চেষ্টা করো হাজার প্রতিবন্ধকতা নিয়েও নিজের পড়াশোনাটা কমপ্লিট করতে, তাতে যদি তোমার সাহিত্য নামক স্বপ্নকে বলি দিতে হয়, দিয়ো। নিষ্ঠুর বাস্তবতার পেছনে স্বপ্ন হাস্যকর হয়ে যায়, যখন মানুষ নিজের পায়ের তলার ভিতটা নিজে তৈরি করতে না পারে।

ওরা বিদেশে আছে, এখনো উড়ালে পাড়ালে জানতে পারে নওশীন, দুসন্তান নিয়ে একই সংসারে নিজেদের মর্যাদাবোধ নিয়ে বাস করছে তারা।

ক্লাস ফাইভে বৃত্তি পাওয়ার বুলবুলিকে জন্ম দিয়ে মা ঘোর শয্যায় পড়লে কোন অবচেতন মায়ায় যে অন্য বোনরা বাদ দিয়ে নওশীন ইস্কুল পড়াশোনা ছেড়ে ওইটুকুন শিশুকে আদরে নিজের সত্তার সাথে মেশাচ্ছিল একদিকে। অন্যদিকে মা'র সেবাযত্নে নিজেকে উজার করে দিয়েছিল নিজেই জানে না। মা'র ব্যাপারটায় অবশ্য সেজপা বেশ সাহায্য করত, বড়পা চেষ্টা করত পড়াশোনার পাশাপাশি আর্থিক সাপোর্ট দিতে, মেজপাকে সংসারের কাজেও সাহায্য করত। বাবা এসে মাঝে মধ্যে টাকা দিয়ে যেতেন। নয় থাকতেন টানা কয়দিন নিঃশব্দ বিমূঢ় হয়ে।

বুলবুলি মারা গেল।

নওশীনের বুকের সাথে সাথে পৃথিবীটাও শূন্য হয়ে গেল। ওই এক বছর ড্রপের সাথে সাথে নওশীন নিজের মেধার শক্তি সম্পর্কে বেশ ক'দিন তার বোধটাকেও যেন হারিয়ে বসেছিল।

মুনিয়া গর্ভে আসার পর আরও এক বছর।

এরপর ইটপাথর মাটি খামচে খামচে হাজার প্রতিবন্ধকতা, লড়াই, যন্ত্রণা সুখের মাঝেও ফের পাঠ্যপুস্তককে নিজের নাগালে নিয়ে এসেছিল সে।

আজ মৌটুসি আর শফিউলের একসাথে অফিস।

ভাঙা রাস্তা পেরিয়ে মূল রাস্তায় উঠে অফিস থেকে এসে দাঁড়ানো গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করে শফিউল, কিছুদূর এগিয়ে দেব ?

বৃষ্টি ঝিমিয়ে গেছে, নওশীন মাথা ঘোরায়, উল্টো পথ পড়বে, তোমরা যাও, বলে রিকশায় ওঠে।

রিকশায় উঠতেই ঝিরঝির বৃষ্টি... চিল্লায় নওশীন, ওয়েলক্লথ বের করো।

আপা নাই। ছিইড়া ফালাফালা হইছিল। আইজ কিননের টাইম পাইলাম কই!

তক্ষুনি মৌটুসি'র 'মা' দিবসে দেওয়া বর্ণিল ছাতাটা ব্যাগ থেকে বের করে নওশীন। কী অদ্ভুত সবুজ, হলুদ, লাল, নীল রঙের ছাতা। হালকা বৃষ্টির নিচে মাথায় সটান দিতেই চারপাশের আলুথালু প্রকৃতির মাঝেও নিজেকে পরী পরী লাগে।

ফোন বেজে ওঠে... এক ঘোর আচ্ছন্নতার মধ্যে ব্যাগ ছাতা সামলে অনেক কায়দা করে ফোন ধরে নওশীন, সুদীপ্তর কণ্ঠ—নওশীন... প্লিজ একবার আমার সাথে দেখা করো।

হাত-পা নিথর হয়ে আসে। সুদীপ্তকে অবজ্ঞা অগ্রাহ্য করার কোনো অধিকার নওশীনের নেই। কিন্তু তুমুল এক ভয় তার নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে দিতে চায়।

তুমি ? এদ্দিন পর ? তোতলায় নওশীন ? কী হবে একবার দেখা করে? কী লাভ ?

আমি দারুণ বিপর্যস্ত অবস্থায় এদেশে এসেছি, তোমার নাম্বার জোগাড় করেছি... তুমিও কি টিপিক্যাল মেয়েদের মতো আমাদের বিয়ের আগের সম্পর্কটাকে পাপ মনে করো ?

রিকশা ঝাঁকুনি খায়। ছাতা উড়ে যায়। রিকশাওয়ালা ছোটে ছাতার পেছন। নওশীনের হুঁশের মধ্যেই থাকে না, সে ভিজছে।

কেন সুদীপ্ত কেন জীবনের এই পর্যায়ে ? এদ্দিন পর ?

আমার জীবনে পর্যায়ক্রমে এমন দুঃসময় এসেছে, নওশীন ভাবে, আমি নিজেকে দিশাহীন বোধ করছি। আমি আর পারছি না।

গতমাসে দুর্ঘটনায় আমার একমাত্র সন্তান সুরেলা মারা গেছে। এরপর...। সুদীপ্তর কণ্ঠ যত কাঁপে তত কাঁপে নওশীনও, কী বলছ তুমি ? কীভাবে ? আমি তো তোমার জীবনের কিছুই জানি না।

সে অনেক কথা, মুনিয়া কেমন আছে ? আমি কি একবার ওকে দেখতে পারি ? জাস্ট একবার ? ওর হাত মুখ ছুঁয়ে যদি আমি একটু সুরেলার স্পর্শের স্বাদ পাই ?

কেঁপে ওঠে ভূমণ্ডল... রিকশাওয়ালা ছাতা এগোয়, ভ্রুক্ষেপ নেই নওশীনের, হতভম্ব হয়ে বলে, তুমি আমার কন্যার নাম জানো কী করে? তুমি এই দীর্ঘ বছরে নিজেকে গোপন করে আমার জীবনের আর কী কী সত্য খোঁজ করেছ ?

ছিঃ! দু'বাংলার মাঝে একটা কাঁটাতার। তোমার বিয়ের বেশ ক'বছর পর কলকাতায় এক পার্টিতে আমার শায়েদ আর তার স্ত্রীর সাথে দেখা হয়েছিল, তোমাদের কথা জিজ্ঞেস করায় জাস্ট ওইটুকুই জেনেছিলাম... নওশীন, আমার সুরেলা মারা গেছে, আমার বুকে এখনো ওকে হারানোর তাজা রক্ত, এর মাঝে তুমি—

আই অ্যাম সরি... এইবার পুরোপুরো ভেতর ভাষাহীন নওশীন... হ্যাঁ আমি দেখা করব, মুনিয়ার সম্পর্কেও জানি না তুমি কী জানো, ওকে দেখলেই বুঝবে, আমি চেষ্টা করছি।

চেষ্টা না, নওশীন নিশ্চিত করো প্লিজ, ফোন কথা শেষ হলে রিকশা ঘোরায় নওশীন। ইস্কুলের মুণ্ডু চিবিয়ে মৃগি রোগীর মতো কাঁপতে কাঁপতে ঘরে ফিরে বিছানায় নিজেকে এলিয়ে দিয়ে নিজের লম্বা দেহটা হেঁটে নয়, কিঞ্চিত বেঁকে হেঁচড়ে ল্যাপটপের সামনে থেকে উঠে আসে মুনিয়া। সস্নেহে বসে নওশীনের কপালে হাত রাখে, কী হয়েছে আম্মু ? আজ ক্লাসে গেলে না ?

কিচ্ছু না... মা কিচ্ছু না... বলে বসে আকুলভাবে মেয়েটার পুরো মুখটাকে পরম মমতায় স্পর্শ করে...।

তুমি এমন করছ কেন মা ? আমরা তো পাখি না... দূরে চলে গেলে চিনব না... নীলটুনির বাচ্চাগুলো চলে গেছে বলে তুমিও কষ্ট পাচ্ছ ?

না... না... তুমি কেন এইসব চলে যাওয়া নিয়ে ভাবছ... আরও অস্থির বোধ করে নওশীন। আম্মু সুরেলার মৃত্যুর সাথে এতকাল পর মুনিয়াকে দেখতে আসার অদম্য স্পৃহার সাথে কী সম্পর্ক থাকতে পারে ?

না... আমি টুইটারে গল্প লিখছি, পাখি আর মানুষের বিচ্ছেদের কথা নিয়ে... শুধু তালগোল পাকায়। মাথা এলোমেলো লাগে।

দেখি, দেখি তুমি কী লিখেছ মহা উত্তেজনার কাঁপনে মুনিয়ার হাত ধরে নওশীন।

কিন্তু বরাবরের মতোই এবারও এ বিষয়ে স্থির অটল রহস্যময় মুনিয়া...এগুলো আমি তোমাদেরকে পড়তে দেব না। এখন কাটিকুটি করছি। পরে সব বাক্য একসাথে সাজাব। আমার এসব তোমরা দেখে ফেললে আমি আর বাক্য বানানোর খেলার মজা পাব না। সাহস পাব না।

নিজের বুকে নিজে বাতাস দেয় নওশীন। ঠিক আছে, তুমি বাক্য ঠিক করো, আমার ঘুম ঘুম পাচ্ছে। আমি একটু রেস্ট নেই ?

ঠিক আছে। বলে মুনিয়া ধীরে ধীরে জানালার পর্দা টেনে লাইটের সুইচ অফ করে যখন মা'র কপালে সুরা দিয়ে ফুঁ দিতে থাকে, ভেতর উজার কান্না এমন দমকে উঠে আর তা প্রতিহত করতে এত জোরে নিজের মুখ নিজেই চেপে ধরে নওশীন, মুনিয়া কিছু টের না পেয়ে চলে যায়। যখন মুনিয়া গর্ভে, অনাহুত বাচ্চার আগমনে বিরক্ত শফিউল সংসার করত যেনবা কোনো অন্তঃসত্ত্বা নারীর সাথে নয়, বিয়ে করে আনা সুস্থ স্বাভাবিক নওশীনের সাথে। ক'মাস এমন গেছে নওশীনের উগরানো

বমি, মাথা ঘোরানো এসব বিষয়কেই অদেখা করে নিজের মধ্যে নিজে এক জগৎ তৈরি করে বলত শফিউল, শরীর খারাপ তো ডাক্তার দেখাও না কেন?

নওশীনের মনে হতো, ঠিকই আছে, এটাই ওর প্রায়শ্চিত। বরং আমার বাচ্চা আমার বাচ্চা করে শফিউল আকুল হলে ভেতরে ভীষণ ভেঙে পড়ত নওশীন। হয়তো দিক-বিদিক হারিয়ে কখন কোন দিশা হারিয়ে কোন সত্য বলে বসত শফিউলকে, তার ঠিক থাকত না। কিন্তু ক্রমে ক্রমে শায়েদ আলাদা করে আবার বুঝিয়েছে নওশীনকে... তুমি যদি ভাব তুমি আর শফিউল ওর বাবা-মা, তবেই পৃথিবীতে আসার পর মুনিয়ার বাঁচাটা সহজ সুন্দর হবে। শফিউলকে বুঝিয়েছে, জন্মের পর মুনিয়া যখন বড় হবে, তখনো যে তোমার এই আর্থিক অবস্থা থাকবে, তা কিন্তু নয়, কিন্তু সে যখন জানবে তার জন্ম তোমার কাঙ্ক্ষিত ছিল না, তুমি তাকে অবহেলা, তাচ্ছিল্য করেছ, হায় বাবার সম্মান আদর পাওয়ার জন্য তুমিই তখন আকুল হবে যখন পাবে না, তখন...।

তখন গর্ভের পাঁচ মাস পেরোলে শিশুটিকে নিয়ে চারপাশের সব ভুলে দুজন একাত্ম হয়েছিল। জন্মের তারিখে ঠিকমতো ডাক্তারের লেখা সময়ের একমাস আগেই জন্মায় মুনিয়া।

সেই রাত। হাসপাতালে গর্ভব্যথায় ছটফট করছিল নওশীন... আচমকা আত্মীয়স্বজনের মধ্যে একজন বলে, ছেলে হলে যেন বাবার চাপা রঙটা পায়, মেয়ে হলে... আরও কী কী কানে যায় নি নওশীনের... যেন সুনামির ঢল বেয়ে দশ হাত নেড়ে চক্রাকারে হিংস্র হাসিতে ঘুরছিল সুদীপ্ত। না... না... এ শফিউলকে মস্ত ঠকানো... নওশীন প্রচণ্ড ভয়ে বীভৎস মুখ করলে শফিউলের মুখ এগিয়ে আসে, তুমি কী ভয় পাচ্ছ? ধুর! আজকাল তো শত শত এমন নর্মাল হচ্ছে।

ফুঁ দিয়ে মুনিয়াকে বুদবুদ বানিয়ে দেওয়া যেত? পেট দু'ভাঁজ করে ওকে নিয়ে চলে যেত অলৌকিক কোনো রাজ্যে? নওশীন গর্ভবতীই না হতো? আহা! কী শান্তি। তার দৃষ্টির সামনে ঝুলতে থাকে একটি ছবি। এক উপজাতীয় মেয়ে মা হলো শিশুটির জনক ছিল প্রকৃতি। মেয়েটি ঘুমিয়েছিল, পথ দিয়ে যাচ্ছিল এক তীরন্দাজ। মেয়েটিকে কাঁপিয়ে নিজে কেঁপে তীরন্দাজ পথেই হারিয়ে গেল। কেবল মেয়েটি জানল প্রকৃতি শিশুটির জনক। গভীর রাতে যেখানে সে ঘুমিয়েছিল, প্রকৃতির সেই ডোবার মধ্যেই শিশুটিকে প্রসব করে সে চলে এল আলোময় সমাজে।

হাসপাতালে কাঁপতে কাঁপতে তেমনই এক অরণ্য এক ডোবা যখন খুঁজছে নওশীন... তখন আলোময় ভয়হীন নগরের জনারণ্যে তার কোলে হাত-পা নেড়ে কাঁদছে মুনিয়া।

স্তন এগিয়ে দেয় নওশীন, খা সোনা খা...।

এরপর যখন বড় হচ্ছে মুনিয়া, শিশুবয়সে দাঁড়ায় না... হাঁটতে পারে না... কিশোরী-বয়সে শিশুর আচরণ করে, যুবতী-বয়সে কিশোরীর মতো কথা বলতেও তোতলায়। ক্লাসের বাইরের দুনিয়াকে ভয়ঙ্কর অসহ্য বোধ করতে শুরু করে। একটি বাক্যও কিছুতেই লিখে শেষ করতে পারে না... প্রথমদিকে ফের সেই ঝাপটা...এ শিশুর জন্ম পাপ থেকে... এ জন্যই এর এই অবস্থা।

প্রেম থেকে...বলেছিল শায়েদ ফিসফিস করে, একজন জীবন থেকে হারিয়ে গেছে বলে এত সুন্দর সম্পর্ক পাপ বলে কেন নিজে ঘৃণিত হও, কন্যাকেও করো?

বিছানায় এসপার ওসপার পাল্টে শায়েদকে ফোন দেয় নওশীন। তোমার সাথে জরুরি কথা আছে, কাল স্কুলে গিয়ে লাঞ্চ টাইমে ফোন দেব। বাসায় এই রিস্ক নেব না।

উঠে পানি খায়... জানালার পর্দা খুলে একটু বাতাস খোঁজে আচমকা এক ভয়ানক ভাবনা তাকে প্রায় বাকশক্তিহীন পঙ্গু করে করে তোলে... মুনিয়া গর্ভে থাকতে সে চিঠি লিখেছিল সুদীপ্তকে আমি সম্ভবত তোমার সন্তানের...। এরপর নবনীতার কাছ থেকে মুনিয়ার জন্ম সন সম্পর্কে একটা সিদ্ধান্তে এসেছিল সুদীপ্ত। এখন নিজ কন্যার মৃত্যুর পর সে মুনিয়াকে...?

পায়ের নিচের মানচিত্র কেঁপে ওঠে, হ্যাঁ এটাই হবে, ফোনে সুদীপ্তকে দিশেহারা লাগছিল... তার পক্ষে এই দাবি তোলা অসম্ভব না।

আমি বলব... এই বাচ্চা তোমার না... বলে যেন দেহে একটু বল পেয়ে বিছানায় নেতিয়ে পড়ে নওশীন... পরক্ষণেই ধনুকের ফলা এসে বিদ্ধ করে,

কী বলছ তুমি? এ বাচ্চা আমার না? ডিএনএ টেস্টে আসি? এখন তো এটা কোনো ব্যাপারই না। না...না... এমন চিৎকার করে ওঠে নওশীন... কুসুম কুসুম... ডাকতে থাকলে মুনিয়া ছিটকে এসে তার সামনে দাঁড়ায়... মুনিয়া, মা আমার, আমি দম নিতে পারছি না, জানালা খুলে... ফ্যানের বাতাস বাড়াও...

ছুটে আসে কুসুমও, বলে সবই তো বাড়ানো আছে, এরপর নওশীনের রক্তাভ চক্ষুমুখ দেখে ভয় পেয়ে কুসুম ফোনে হাত দেয়, ভাইজানরে ফোন দেই। আরও জোরে চিল্লায় নওশীন, না না। সর্বনাশ হয়ে যাবে তুই যা... একটু দইয়ের লাচ্ছি নিয়ে আয়, আমি শরীরে শক্তি পাচ্ছি না।

কুসুম ছুটে চলে গেলে মাথা স্থির করে ঘুমানোর জন্য ক'টা স্লিপিং পিল খেয়ে দেখে অসহায়ের মতো তাকিয়ে কাঁপছে মুনিয়া। ওকে আমূল জড়িয়ে শুয়ে পড়ে নওশীন। আমাকে ছেড়ে যাবে না? এইভাবে আজীবন আমার প্রাণের সাথে মিশে থাকবে, সত্যি বল মা?

কাঁদতে থাকে মুনিয়া... তুমি এমন বলছ কেন আম্মু? সব ওই নীলটুনিদের কাণ্ড। কুসুমকে বলো, ছাদ থেকে ওদের নিয়ে অন্য কোথাও নিয়ে যাক। আমি যাব না... কেঁদো না আম্মু... তুমি কাঁদলে আমার বুক পুড়ে।

ওর কথা এমনই। এরপর যেনবা শিশু নওশীন, মুনিয়া মা, এইভাবে ওর মাথায় হাত বুলাতে থাকে।

শফিউলের হিংস্র চোখ.. এমনিই বেশ্যা বলতাম...? ও গড! এত বছর এই পাপকে আমি আমার কন্যাস্নেহে? চারপাশের আত্মীয় সমাজের পায়ের তলায় ভূলুণ্ঠিত মুনিয়া, নওশীন.. মৌটুসির করুণ ক্রুদ্ধ বিস্ময়ভরা চোখের সামনে শফিউল উন্মাদের মতো পাক খায়... এদের পাপ তোর আমার গা-কেও নোংরা করেছে... এই পৃথিবী আমাদের আর এক পা হাঁটতে দেবে না... বন্দুকের নল তাক হয়... দুটো শব্দ... ভূলুণ্ঠিত হতে থাকে মৌটুসি আর শফিউলের দেহ।

এই ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নময় ভাবনায় নওশীন অবুঝ শিশুর মতো ভয়ে যত আঁকড়ে ধরে মুনিয়াকে... তত মুনিয়া তার চোখে ঠোঁটে চুমু খায়... ভয় পায় না লক্ষ্মী মেয়ে... এই তো আমি আছি তোমার সাথে।

শৈশব থেকে দেওয়া নওশীনের আশ্বাস এত তীব্র মায়া আর দায়িত্বের সাথে দেয় মুনিয়া, নওশীন যত অবাক হয় তত যেন অদ্ভুত এক ভরসায় সিক্ত হতে হতে ঘুমিয়ে পড়ে।

দুপুরে ঘুম ভাঙে শায়েদের ফোনে। ওষুধের ঘোরে আচ্ছন্নতা কাটে না। নওশীনকে জড়িয়ে মুনিয়া ঘুমিয়ে আছে। না, এসব কথা নিয়ে শায়েদের সাথে কথা বলার শক্তি অবস্থা কিচ্ছু নেই। ফোন বন্ধ করে তলাতে থাকে নওশীন। সুদীপ্তর সাথে মুনিয়াকে নিয়ে দেখা করার অবস্থাটাই রীতিমতো বিপদজনক। শফিউল এক পশলা টের

পেলে পৃথিবী লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে। জীবনে কতবার কত একাকী ফিনকি মুহূর্তে যে সাধ হয়েছে একবার যদি সুদীপ্ত'র মুখোমুখি হওয়া যেত ? এই জীবনে প্রেফ একবার ?... কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মুনিয়ার ছায়া এসে ঢেকে দিয়েছে সেই আকাঙ্ক্ষা। নওশীনরা সপরিবারে মুম্বাই গেছে, আগ্রা গেছে... কিন্তু কোনোদিন শফিউল কলকাতা নামটি পর্যন্ত উচ্চারণ করতে চায় নি। সুদীপ্ত শফিউলের কাছে এমনই এক ভয়ঙ্কর ভূতের নাম... কোনোদিন সন্দেহ করে হাজার ঝগড়ার মারপিটের মাঝেও সে অনেক কুৎসিত কথা বললেও সুদীপ্ত নামটি পর্যন্ত উচ্চারণ করে নি। যেন নওশীনের জীবনে এমন কেউ ছিল সে যেমন জানে না, নওশীনও না জানুক।

রাতে খেতে বসে গলা দিয়ে খাবার নামে না।

কী হয়েছে তোমার ? মৌটুসি বলল, ক্লাসে যাও নি, সারাদিন শুয়েছিলে।

না, কিছু না।

কিছু না বললেই হলো ? শফিউল উঠে এসে নওশীনের কপালে হাত রাখে... হালকা জ্বর জ্বর... কিন্তু তোমার নাক, চোখ-মুখ এমন ফুলে আছে কেন ? কী, বোধ করছ কী ?

মস্তিষ্কে চিরুনি চালায় নওশীন... রিকশায় যাচ্ছিলাম... হঠাৎ রাস্তায় বমি... এরপর তলপেট থেকে বুক পর্যন্ত এমন ব্যথা... ও গড... এসিডিটির সব ওষুধ খেয়েছি... কিছুটা কমেছে, পুরোটা না. ক'দিন ধরেই এমন হচ্ছে, শরীরে শক্তি পাই না... রুচি পাই না... বুক জ্বলে জ্বর লাগে।

সিজনটা খারাপ যাচ্ছে, শফিউল কেয়ারিং হয়, অসুখ এমন পুষে রাখলে চলবে ? আর ঘোড়ার ডিমের চাকরিটা ছেড়ে দাও না। জীবনে তো কম সময় গেল না সংসারের খরচের প্রতি তোমার অধিকার নেই নাকি ? কী যে একটা গোঁয়ার্তুমি ভাবনা পুষে চল, তুমিই বুঝো ।

আহা! এমন কথা কতকাল পর। অবশ্য শফিউল জানে, হাজার আপোষেও যখন টাকা উপার্জন করতে পারত না নওশীন, সে নিজের এক টাকার জন্যও হাত পাততে না শফিউলের কাছে। মুনিয়ার অস্বাভাবিক বাড়ন্ত আচরণ দেখার আগ পর্যন্ত শফিউলের অজান্তে মুনিয়ার জন্যও না। এ নিয়েও কম তো টিটকারি সহ্য করতে হয় নি নওশীনকে। কিন্তু দিনের পর দিন মুনিয়ার ব্যয়বহুল চিকিৎসার সামনে নতজানু হতে হয় নওশীনকে। আর একসময় এনজিওতেও শফিউল দীর্ঘদিন কাজ করতে করতে কীসব দু'নম্বরি পথ বেয়ে পকেট ফুলাতে থাকে শফিউলের। যা নিয়ে মাথা ঘামানোর ন্যূনতম প্রয়োজন বোধ করে নি নওশীন।

এক সপ্তাহ ছুটির নোটিশ দেব। তারপর দেখি।

ইতোমধ্যে পরিবারে এক বিস্ময়কর আনন্দময় ঘটনা ঘটে। মুনিয়া 'নীলটুনি আর মানুষ জননী', এ নিয়ে একটি চমকপ্রদ মনস্তাত্ত্বিক লেখা লিখে মৌটুসির সাহায্যে এশিয়ান তরুণ লেখকদের প্রতিযোগিতায় পাঠায়। গল্পটি প্রথম হলে দেশে আর মুনিয়ার বাড়িতে রাতারাতি হাওয়া পাল্টে যায়। একজন অটিস্টিক মেয়ের প্রতিভা নিয়ে পত্রিকা টিভি মাতামাতি করতে থাকলে শফিউল অহঙ্কারে আনন্দে মিডিয়ার সামনে কেঁদে ফেলল প্রায়।

১৬

তক্ষুনি ছুরিটা শাণাতে থাকে নওশীন।

আমি অভিভূত। মুনিয়া অটিস্টিক এটা জানতাম না... কেমন যেন জোর নিঃশ্বাস নিয়ে টেনে টেনে সুদীপ্ত বলে, ভীষণ মায়া ওর চেহারায়, তোমার হাজব্যান্ড তাকে খুব ভালোবাসে, না ?

তোমার হাজব্যান্ড ? নওশীনের স্থিত মায়ার শান্ত ছুরির ধার বাড়তে থাকে।

হ্যাঁ। ওর বাবা ওকে খুব ভালোবাসে।

টিভিতে ওকে দেখে আমার চোখে জল এসে যাচ্ছিল, সুরেলাকে মনে পড়ছিল। আমার পাসপোর্টের মেয়াদ বেশিদিন নেই, প্লিজ তুমি একবার...।

আমাকে আরেকটু সময় দাও।

একসময় আমি তোমার কাছে প্রচণ্ডভাবে এই সময়টাই চেয়েছিলাম, ভীষণ বিপন্ন শোনায় সুদীপ্তর কণ্ঠ, আজ শোধ নিচ্ছ, আমি সামনে না এলে আমার অবস্থাটা তোমাকে বুঝাতে পারছি না। তুমি যত সময় নিচ্ছ, তত পাহাড়ের মতো ভার আমাকে তলানোর পর তলাচ্ছে, তুমি কেন এমন করছ আমার সাথে ? ন্যূনতম মানবিকতা বোধও তোমাকে স্পর্শ করা ছেড়ে দিয়েছে ? আমার কী অপরাধ ছিল তোমার জীবনে ? নওশীন সেদিন থেকে এসেছি আমার ভেতর এত আঁধার আর বেদনার চক্কর, প্লিজ নওশীন আমাকে ফিরতে হবে, কী অবস্থায় এসেছি এ তোমার কল্পনার বাইরে, প্লিজ।

নওশীনের কণ্ঠে টানা স্তব্ধতা, বলে ও.কে কী কাল দুপুর দু'টায় এসো।

থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, নওশীন। ঠিকানা লোকেশন বুঝে নিয়ে সুদীপ্তের ভেজা কণ্ঠে আকুলতা।

এ নিয়ে একদিন অনেক কথা হয়েছে শায়েদের সাথে, নিজেকে সুদীপ্ত কর্ণ বলত আজ ওর বর্ম ভূষণ খসে পড়েছে... সে তার ঘাতিনী শক্তি দিয়ে আজ আমার এতদিন ধরে টিকিয়ে রাখা রক্ষা ভূষণ কুণ্ডলে ঘা দিয়ে সব তছনছ করতে চায়, আমি জানি ওর জীবনের কাছে ও অসহায়, আজ সে এতকাল পর তার রক্তের দাবি নিয়েও আমার পৃথিবীকে কারবালা বানাবে... না...আমি সইতে পারব না।

তুমি খামোকাই ব্যাপারটাকে এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখছ, শায়েদের কণ্ঠে ভরসা, সুদীপ্ত তোমার এত বড় ক্ষতি চাইবে না।

বোঝার চেষ্টা করো, সবে সে তার একমাত্র কন্যাকে হারিয়েছে... সে হয়তো মুনিয়ার কাছে এসে একটু নিঃশ্বাস একটু স্বস্তি নিতে চাইছে ?

মুনিয়ার কাছেই কেন ? অসহায় ক্রোধে কাঁদে নওশীন। সুদীপ্তর মাথার মধ্যে ঠিক এই ব্যাপারটা আছে, ধীরে ধীরে আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি, আমাদের একটি সম্পর্কের সূত্র ধরে তারই এক আত্মজা এই দেশে আছে, তুমি বলো, ও যদি আছারি-বিছারি করে বলে, নওশীন তোমার তো দুইজন মেয়ে, তুমি আমার দিকটা দেখো... যদি বলে তুমি একটি কন্যাকে আমাকে দেবে না ? যে কি না আবার আমার কন্যা, তাকে পাওয়ার কোনো অধিকারই আমার নেই ? বলো শায়েদ, আমি তখন কী করব ? কী হবে আমার অবস্থা।

উফ নওশীন... তুমি নিজের মধ্যে নিজে কী কী সব তৈরি করে মনকে মহাভারত বানাচ্ছো, তাকে কিছু বলতে দেওয়ার আগেই না তুমি সব তছনছ করে দাও। মাথা ঠাণ্ডা করো, তোমরা আমার বাসায় আস। আগে তো শুনি, ও কী বলে, এরপর আমি আছি না ? আমি ওর সাথে কথা বলে দেখেছি মুনিয়াকে নিয়ে তুমি যেমন পাগল হয়েছ এসব ওর মাঝে নেই। কীযে এক গভীর ব্যথায় মুহ্যমান, ও নিজেই জানে।

আমি জানি... সাপের মতো শীতল নওশীনের কণ্ঠ। আমাকে ঠাণ্ডা মাথায় একটু ভাবতে দাও।

কচকচে ভোরে মুনিয়াকে নিয়ে ছাদে যায় নওশীন। বড় নির্ভার এই বাতাস...

কতদিন পর আষাঢ়ের হালকা বাতাসে মিষ্টি করে সূর্য উঠছে। ভীষণ অবাক হয়ে নওশীন দেখে, একটি গাছে দুটি বুলবুলি বাসা বাঁধছে। ওদের ডানার ঝাপট... আর পায়ুপথ তো নয়, যেন ক্ষুদে রক্তজরা... দিব্যি নীলটুনিদের সাথে এক খাতিরে কিচমিচ করছে।

আম্মু... আমাকে নিয়ে এত মানুষ এত হইচই করল কেন? আমি কী করেছি?

তুমি তো যে ক্ষমতা আর শক্তি সম্পর্কে নিজে জানতে না, লজ্জায় আমাদেরও জানতে দিতে না... তোমার সেই ক্ষমতা পৃথিবী দেখেছে... আর তোমাকে দুর্বল বা পাগল এসব বলে কোনোদিন কেউ হাসবে না?

আমি তো যারা হাসত তাদের কাছে আর যাই না, তো?

এখন যাবে, দৃঢ় কণ্ঠে বলে নওশীন। জানি তুমি যেতে রাজি হবে না... সেটা আমি দেখব, তুমি দেখবে তোমার চারপাশের পৃথিবী কত সুন্দর। সেখানে তোমার কত সম্মান, বলে নওশীন বুলবুলির পেছনে ধাবিত হয় একদিকে, আরেকদিকে টের পেয়ে থাকে তার মস্তিষ্কের পেন্ডুলাম এদিক থেকে ওদিক হতে হচ্ছে।

দুটোর সময় ঘুমিয়ে থাকবে মুনিয়া। কুসুমও ও সময় তখন তন্দ্রায় ঢোলে। আজ কুসুমকে ঘুমিয়ে পড়তে বলেছে নওশীন। রোজ বেচারি কাজের জন্য এইসময়টায় ঢোলে, ঘুমানোর অবকাশ পায় না।

সুদীপ্ত এসে ওর যে-কোনো বেদনা নিয়ে হাহাকারে পড়তে পড়তে মুনিয়ার নাম নিলেই নওশীন একেবারে ওর নিঃশ্বাসের কাছে গিয়ে গরুর মাংস কাটার ঝাঝালো ছুরিটা ঝটিতে ওর গলায় বসিয়ে কষে একটা পোচ দেবে জাস্ট...।

সব খতম।

এই অন্ধকার, প্রতিমুহূর্তের, দিন রাতের টেনশনে মুনিয়া এক কঠিন বদ্ধ ভাবনায় স্থির হয়, আগে মুনিয়া নওশীনের কন্যা... এরপর শফিউলের। ওর রক্তে, চরিত্রে আর কোনো দাগ লাগার প্রশ্নই আর থাকবে না।

আম্মু... বুলবুলিটা তোমাকে ভয় পাচ্ছে।

না... বুলবুলি আমাকে ভয় পায় না। আমি ওকে কোলে করে পেলে পুষে যখন বড় করতাম... তখন সে আমার ছাড়া আর কারও মুখ চিনত না।

কীসব বলো তুমি আম্মু, বুঝি না।

বাতাসে কী বর্ষা আগমনের ঘূর্ণি ধ্বনির শব্দ হচ্ছে?

নীল নীহারিকায় তুলো তুলো মেঘ ফেণা হয়ে উড়ছে, ধীরে গিয়ে তার মায়াবী হাত পেতে দিল সামনে। একটা বুলবুলি ঘর বানাচ্ছে... মুনিয়াকে বিস্মিত করে দিয়ে আরেকটা বুলবুলি ওর পেতে রাখা হাতের তালুতে নিঃশব্দে এসে বসল।

বাহ্! বুলবুলি... কত বড় হয়েছিস তুই! তোর সখা খুঁজে পেয়েছিস?

১৭

দুপুরে বুকে হাতুড়ির ঘন্টা।

অন্ধকার ঘরে ঘড়ির দিকে ঠায় তাকিয়ে নিশ্চল বসে থাকে নওশীন।

ফোন বাজে। ক্রমশ শায়েদের কথাগুলো শুনতে শুনতে কখনো নওশীনের দেহ শক্ত হয় কখনো শিথিল হয়ে ভেঙে ভেঙে পড়তে চায়। এক রুদ্ধশ্বাস নিঃশ্বাস চাপা অবস্থায় বালিশে মুখ গুজে না আলো না ছায়া... না বাতাস কিচ্ছু খোঁজে না। সুরেলার এক্সিডেন্টের কমাস আগেই সুদীপ্তর ব্রেন ক্যান্সার হয়েছে। কদিন বাঁচবে জানে না। শরীর মনের দমবন্ধময় অবস্থায় আত্মীয়-ডাক্তারদের বারণ তোয়াক্কা না করে জাস্ট একবার দেখতে চেয়েছিল মুনিয়াকে, নওশীনকে। এসবই সে বলেছে নওশীনের সন্দেহ সুদীপ্তর সামনে তুলে ধরার পর। ক্ষোভের সাথে বেদনাও ছিল শায়েদের কণ্ঠে, মুনিয়াকে নিয়ে তোমার সন্দেহের এক পর্যায়ে হ্যাঁ ঠিক, তোমার চিঠির পর সে প্রতিনিয়ত নিজের মধ্যে তার অস্তিত্ব অনুভব করেছে, কিন্তু তা নিজের ভেতরই নিজে দাবিয়ে রেখেছিল। সুরেলা'র চলে যাওয়ার পর নিজের আসন্ন মৃত্যুর সময় মুনিয়াকে, তোমাকে দেখতে চাওয়া কি এতটাই অস্বাভাবিক ছিল? তুমি তো স্বার্থপর হয়ে তোমার জীবনে ওর ত্যাগের মহত্বটা দেখতেই চাইলে না?

কোথায় আছে ও? কবে যাবে? আমি একবার...?

জানি না আমি, ভীষণ শান্ত আর ঠান্ডা শোনাচ্ছিল শায়েদের কণ্ঠস্বর। দয়া করে আর অস্থির হয়ো না। তোমাদের আমার বাসায় আসার কথা ছিল আর তুমি আমাকে না জানিয়ে তোমার বাড়িতে ডেকেছিলে, কেন? নওশীন আমি অসহ্য হয়ে গেছি। মনে করো, মাঝে সুদীপ্ত আসে নি, জীবনে যেমন অনেক পর্যায় এমন ভুলে গিয়ে গিয়ে কাটিয়েছ, তাই করো, এইবার একেবারে মন আর মগজকে পোক্ত করো। ওর আসা, কথা বলা... পুরোটাই তোমার স্বপ্ন ভ্রম... ও. কে?

নওশীনের প্রথম দমবন্ধ কাটে কিছুক্ষণ, এরপর প্রায় চিৎকার করে জিজ্ঞেস করে সে, তুমি জানো ও কোথায় আছে, জীবনের এই পর্যায়ে আমাকে এতবড় শাস্তি দিয়ো না শায়েদ, যেহেতু সত্যটা জেনেছি, একবার স্রেফ একবার ওর সাথে দেখা করতে দাও। শায়েদ দোহাই...।

বলেছি তো জানি না, ভেঙে পড়তে থাকে শায়েদের কণ্ঠ, আমি ফোন রাখছি,

আমার আল্লাহর কসম লাগে, সত্যি বলো, কী অবস্থা ওর, আমি এভাবে থাকলে দম আটকে মারা যাব, শায়েদ তোমার পায়ে ধরি।

সুদীপ্ত মারা গেছে... ভেতরের কঠিন স্তব্ধতা ভেঙে খানখান করে দিয়ে শায়েদের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসে এই বাক্য... এরপর যেন বাক্য নয় ঘূর্ণায়মান কিছু ধ্বনি—আসার পর থেকেই সে হাসপাতালে ভর্তি ছিল, আজ যেভাবেই হোক তোমার কাছে যাওয়ারও প্ল্যান ছিল ওর, সকালে অবস্থা খারাপ দেখে আমাকে ফোন দেয়... এরপর একসময় আমার সামনেই... কণ্ঠ ভারী হয়ে আসে শায়েদের, কমেছে টেনশন? শান্তি হয়েছে? এখন তুমি এ ব্যাপারে মুক্ত। আলো আবছায়ায় পাক খায়, ঢেউ খায় নওশীনের আত্মা... হা হা! কী মুক্তি, মুক্তির আনন্দের কী মোহনীয় রূপ! সব দুঃস্বপ্ন... কোনো ভয় নেই মুনিয়াকে নিয়ে, হা হা হা টেনশান নেই, ঘুরতে ঘুরতে নওশীনের অবচেতন পা কখন যে ছাদের উদ্দামে যায়, ঠাহর করতে পারে না। ক'দিনের গুমোট কষ্ট থেকে বেরিয়ে মুক্তির আনন্দে কষে নিঃশ্বাস নিয়ে হাসতে যাবে, বুক বেয়ে বিষাক্ত বেদনার দলা উঠে রুদ্ধশ্বাস করে দেয় সব... চিৎকার করে কাঁদে নওশীন... কেন একদিনের জন্যও আমার জীবনটা আমার ছিল না? আমার জীবনকে আমি এভাবে চাই নি, এ চাই নি... কখনো না কোনোদিন না... স্থিত দুপুরে একজন নারীর এমন মরণ আর্তনাদে চারপাশের পরিবেশগুলো বিস্ময়ের কাঁপনে জাগতে শুরু করে। ■